বাংলা

যুবকভারতী

দ্বাদশ শ্রেণী

ভারতের সংবিধান

ভাগ 4 ক

মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ 51 ক

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে ;

(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বত হলে সাড়া দিতে হবে ;

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে;

(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে;

(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিসা, সংস্কারমূলকমনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে;

(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে;

(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে;

(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সেরপ্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস - ২১১৬/(প্র.ক্র.৪৩/১৬) এসডী-৪ তারিখ-২৫.০৪.২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ ৩০.০১.২০২০ এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

বাংলা

যুবকভারতী

দ্বাদশ শ্রেণী

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে

L6K3J2

আপনার স্মার্টফোনের 'DIKSHA APP' দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার QR.Code এর মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠের সম্বন্ধে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের জন্য উপযুক্ত দৃক-শ্রাব্য সাহিত্য উপলব্ধ হবে।

First Edition : 2020
Reprint : 2022

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে ৪১১০০৪এই বইয়ের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের কাছে থাকবে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না।

বাংলা ভাষা সমিতি

শ্রী মহাদেব শ্যামাপদ মল্লিক (অধ্যক্ষ)
শ্রী দিলীপ অনুকূল রায় (সদস্য)
শ্রী রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্র হালদার (সদস্য)
শ্রী শিবপদ রসিকলাল রপ্তান (সদস্য)
শ্রীমতী বাসন্তী রথীন্দ্রনাথ দাসমন্ডল (সদস্যা)
শ্রীমতী শিখারানী শ্রীনিবাস বারই (সদস্যা)
শ্রী মাখন ব্রিটিশ মাঝি (সদস্য)
শ্রী রামপদ কালীপদ সরকার (সদস্য)
শ্রী উত্তম উপেন মজুমদার (সদস্য)
ডা. অলকা পোতদার (সদস্য - সচিব)

বাংলা ভাষা অভ্যাস গট

শ্রী দীপক হরিদাস হালদার
শ্রী অতুল নগরবাসী বালা
শ্রী. বাবুরাম অমূল্য সেন
শ্রী. শঙ্কর অমূল্য মণ্ডল
কু তৃপ্তিলতা প্রমথেশ বিশ্বাস
শ্রী অনিল ধীরেন বারই
শ্রী তপন পঞ্চানন সরকার
শ্রী বাসুদেব ইন্দুভূষণ হালদার
শ্রী পরিমল কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল
শ্রী স্বপন বিশ্বানাথ পাল
শ্রী অজয় কার্তিক সরকার
শ্রী সঞ্জয় দুখীরাম মণ্ডল
শ্রী শ্যামল সৌরভ বিশ্বাস
শ্রী হরেন্দ্রনাথ সুধীর সিকদার
শ্রী অরুণ দীনবন্ধু মণ্ডল
শ্রী মহীতোষ কালাচাঁদ মণ্ডল
শ্রী ভবরঞ্জন ইন্দুভূষণ হালদার
শ্রী নিথিন বিনয়ভূষণ হালদার
শ্রী অনিমেশ অরুণ বিশ্বাস
শ্রীমতী শ্রীবর্ণা সাহা
শ্রীমতী পিঙ্কী সাহা
শ্রী সুজয় জগদীশ বাছাড়

প্রকাশক :
বিবেক উত্তম গোসাবী
নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি মণ্ডল, প্রভাদেবী, মুম্বাই ২৫

সংযোজক
ডা. অলকা পোতদার
বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা
পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে
সহায়ক সংযোজক
সৌ. সন্ধ্যা বিনয় উপাসনী
সহায়ক বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা

নির্মিতি :
শ্রী সাচ্চিতানন্দ আফড়ে
মুখ্য নির্মিতি অধিকারী
শ্রী রাজেন্দ্র চিন্দরকর
নির্মিতি অধিকারী
শ্রী রাজেন্দ্র পাণ্ডলোস্কর
সহায়ক নির্মিতি অধিকারী

মুখপৃষ্ঠ : শ্রী বিবেকানন্দ পাটিল
চিত্রাঙ্কন : শ্রী যশবন্ত দেশমুখ
অক্ষরাঙ্কন- ডিজাইনিঙ্গ : সমর্থ গ্রাফিক্স্ ৫২২ নারায়ণ পেঠ, পুণে ৩০
কাগজ : ৭০ জী.এস.এম. ক্রিমবোভ
মুদ্রণাদেশ :
মুদ্রক :

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

''আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,

বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম

এবং উপাসনার স্বাধীনতা,

সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন

ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা

এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য

ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে

তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।''

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।।

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

প্রস্তাবনা

স্নেহের শিক্ষার্থী বন্ধুগণ,

তোমাদের সবাইকে দ্বাদশ শ্রেণীতে আন্তরিক স্বাগত জানাই। তোমাদের জানাতে আনন্দবোধ করছি যে বালভারতী, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণের পক্ষ থেকে প্রথমবার দ্বাদশ শ্রেণীর 'বাংলা যুবকভারতী' বই তোমাদের হাতে তুলে ধরেছি। এই পাঠ্যপুস্তকে বাংলা ভাষার মাধুর্য, বাঙালি সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে মাতৃভাষার মহত্ত্ব অতুলনীয়। যেহেতু অল্পসংখ্যক বাঙালি মহারাষ্ট্রের অধিবাসী তাই বাংলার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষা অধ্যয়ন একান্ত বাঞ্ছনীয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দ্বাদশ শ্রেণীর কৃতিপত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় মূল্যায়ন করা হবে। তাই আকলন, উপযোজন এই দুই কৌশল্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য দিতে হবে, এইজন্য পাঠের শেষে কৃতিযুক্ত অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ সাহিত্যে তোমরা 'লঘুকথা বা ছোটগল্প'- সাহিত্যের বিশেষ বিধার সহিত পরিচিত হবে। পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি পাঠে প্রয়োজন অনুযায়ী ছবি দেওয়া হয়েছে, যার ফলে তোমাদের পাঠের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে সুবিধা হবে। আর্থিক দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ করা বিশেষ প্রয়োজন। রোজগারের সম্ভাবনা নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে রেডিও জকি, ব্লগ লেখন, ফিচার লেখন ও ভাবসম্প্রসারণ ইত্যাদি পাঠ্যক্রমে সমাবেশ করা হয়েছে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি মোট পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যার ফলে তোমাদের অধ্যয়নের নিয়োজন করতে সুবিধা হবে। ভাষা ও জীবনের সম্বন্ধ অভিন্ন। জীবনের সমস্যা সমাধানের শক্তি ভাষায় আছে। ভাষাকে দৈনন্দিন জীবনে যাতে তোমরা উপযোজন করতে পারো এই উদ্দেশ্যে ভাষা রূপে বাংলা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য দাও।

তোমাদের বিচারশক্তি কল্পনাশক্তি সৃজনশীলতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য অনেক কৃতি এই পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে প্রথম পৃষ্ঠায় কিউ আর কোড দেওয়া আছে। কিউ আর কোড দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য তোমাদের মার্গদর্শন করবে।

তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করে আদর্শ নাগরিক হও। দেশ উন্নয়নের কাজে নিজে কে উৎসর্গ করো। তোমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

(বিবেক উত্তম গোসাবী)
সঞ্চালক
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও
অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে ০৪

পুণে
তারিখ : ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২০
ভারতীয় সৌর : ২ ফাল্গুন ১৯৪১

বিষয় : বাংলা

ভাষা বিষয়ক ক্ষমতা **দ্বাদশ শ্রেণী**

অ.ক্র.	ক্ষেত্র	ক্ষমতা (দ্বাদশ শ্রেণী)
১.	শ্রবণ	১) সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে নিহিত আলংকারিক সৌন্দর্য এবং রসবোধ আস্বাদন করে শুনতে এবং শোনাতে হবে। ২) বিভিন্ন জনসঞ্চার মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত বিষয় বস্তু আকলন করে শোনা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ব্যবহার করে শোনান।
২.	বক্তৃতা ও কথোপকথন	১) বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সহভাগী হয়ে সেই অনুষ্ঠানের সূত্রসঞ্চালন করা। ২) বিভিন্ন বিষয়ের সংলাপের সহভাগী হয়ে নির্ভীক রূপে আলোচনা করা । ৩) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমকালীন বিষয়কে বেছে নিয়ে তার পরে সমষ্টিগত আলোচনার আয়োজন করা।
৩.	পঠন	১) কার্যকর ব্যক্তিত্ব উন্নয়নের জন্য মহাপুরুষদের বাণী এবং সাহিত্যিকদের রচনা অধ্যয়ন করা। ২) বিভিন্ন বিভাগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনী/ আত্মকথা পাঠ করা। ৩) সংগণক (কম্পিউটার) এ ব্যবহৃত লিপি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তার ব্যবহার করা ।
৪.	লেখন	১) ফিচার লেখন এবং বৃত্তান্ত লেখনের অধ্যয়ন, লেখন বৃত্তান্ত লেখনের অধ্যয়ন, লেখন কার্য করা। ২) ফিচার লেখন এবং বৃত্তান্ত লেখনের অধ্যয়ন লেখন কার্য করা। ৩) বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য আবশ্যক লেখন করা।
৫.	ভাষা- অধ্যয়ন	১) রস, শৃঙ্গার, শান্ত, বীভৎস, বীর, অদ্ভুত। ২) অলংকার (অর্থালঙ্কার)। ৩) বাক্য শুদ্ধিকরণ, কালপরিবর্তন, বাগধারা।
৬.	অধ্যয়ন কৌশল্য	১) সাক্ষাৎকারের নমুনা তৈরী করা এবং সাক্ষাৎকার কর্তার গুন আত্মসাৎ করা। ২) স্পর্ধা পরীক্ষার জন্য আবশ্যক নিয়োজন করা। ৩) বাংলা ভাষা এবং রোজগারের সম্ভাবনাকে অবগত করা। ইন্টারনেট, কিউ, আর কোড বিভিন্ন চ্যানেল দেখে উপয়োগ করা।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের জ্ঞাতার্থে....

সম্মানীয় শিক্ষক / অভিভাবক বৃন্দ।

আপনাদের জানাতে আনন্দবোধ করছি যে বালভারতী মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণের পক্ষ থেকে প্রথমবার দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা যুবকভারতী বইটি আপনাদের হাতে তুলে ধরেছি। এই পাঠ্যপুস্তকে বাংলা ভাষার মাধুর্য, বাঙালি সংস্কৃতি, রীতিনীতিও বাংলা ভাবধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকটিতে অতি পরিচিত ও প্রচলিত লেখক-

লেখিকার রচনা স্থান পেয়েছে। এরকম একটি বই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো এই বর্তমান প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে অবহিত ও পরিচিত করানো। আমরা মনে করি যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পঠন-পাঠন বিদ্যালয় শিক্ষা ও স্নাতক স্তরের শিক্ষাক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। সুতরাং এই স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্যের বিষয়গত আঙ্গিক বৈচিত্রের একটি সম্যক ধারণা থাকা উচিত। সমিতির চিন্তাভাবনাকে লক্ষ্য করে বইটিকে মোট পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম দুই বিভাগে মোট ছয়টি গদ্য ছয়টি পদ্য রয়েছে। প্রতিটি গদ্য, পদ্য দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষমতা, অভিরুচি ও উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে নির্বাচিত করা হয়েছে। সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পরীক্ষা বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নয়, সাহিত্য পাঠের মধ্যে যে আনন্দ আছে, একটি কবিতা বা গল্পের মধ্যে যে ভালো লাগার রসদগুলো রয়েছে উহা আত্মসাৎ করাই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। সেই সূত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। শিক্ষার্থীরা যদি একটি গল্প বা কবিতা বা প্রবন্ধ ভালো করে পড়ে উপলব্ধি করতে পারে ও সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারে তাহলে যেকোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার পক্ষে কঠিন হবে না। তৃতীয় বিভাগে অর্থাৎ বিশেষ সাহিত্যে রয়েছে 'লঘুকথা বা ছোটগল্প'। এই বিশেষ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো ছোটগল্প বা লঘুকথার রসাস্বাদন করা এবং রচয়িতার রচনা কৌশল্যকে অধ্যয়ন করা। চতুর্থ বিভাগে রয়েছে 'ব্যবহারিক-লেখন'। এই বিভাগে মোট চারটি প্রবন্ধ রয়েছে যার উদ্দেশ্য দৈনন্দিন জীবনে বাংলা সাহিত্যের ব্যবহার ও রোজগারের বিভিন্ন সুযোগ অনুসন্ধান করা। এই নতুন পাঠ্যক্রমের প্রতি পাঠের প্রারম্ভে কবি / লেখক / লেখিকা পরিচিতি, পাঠ / কবিতার মূলকথা এবং পাঠের উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে আকর্ষণীয় ছবিও দেওয়া হয়েছে। ছবি দেখে এবং মূলকথা পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কবিতা বা পাঠটিকে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। পাঠের শেষে রয়েছে শব্দার্থ এবং কৃতিযুক্ত অনুশীলনী। প্রতি অনুশীলনীতে আকলন, শব্দ সম্পদ, অভিব্যক্তি, লঘুত্তরী প্রশ্ন, সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান, ব্যাকরণ ইত্যাদি সমাবিষ্ট করা হয়েছে। পাঠ্য পুস্তকের আরম্ভে কিউ আর কোড দেওয়া আছে যার মাধ্যমে বইটির সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। পাঠ্যপুস্তকটিকে Diksha APP এ আপলোড করা হয়েছে। সেখান থেকে বইটি ডাউনলোড করা যাবে।

এই নতুন পাঠ্যক্রমের মূল লক্ষ্য সেটাই ছাত্র-ছাত্রীরা যা পড়েছে তা ভালো করে জানুক, বুঝুক ও শিখুক আর তখন সে নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকদের দায়িত্ব হল সেই কাজে শিক্ষার্থীদেরকে সাহায্য করা, সঠিক পথ দেখানো, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো অসুবিধা না হয়। তার চিন্তা-ভাবনা ও লেখার মধ্যে স্বকীয়তা ফুটে ওঠে । শিক্ষক / অভিভাবক শিক্ষার্থীকে সঠিক পথটা দেখিয়ে দেবেন, আপনাদের জ্ঞান ও অনুভবের আলোয় শিক্ষার্থীর চলার পথের অন্ধকার দূর করবেন- আর সেই পথে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলুক দৃঢ় পদক্ষেপে আর শিক্ষক-শিক্ষিকারা হোক তাদের আলোর পথের দিশারী। উভয়পক্ষকেই জানাই সমিতির পক্ষ থেকে আগাম শুভেচ্ছা। এই পাঠ্যপুস্তকটিতে যে সমস্ত লেখক-লেখিকার রচনা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে সেগুলি মুদ্রণের জন্য অনুমতি দিয়ে তারা আমাদের বাধিত করেছেন। সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সমাজের যোগ্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই পাঠ্যপুস্তকটি সমীক্ষণ করে ইহাকে করে তুলেছে আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তাদেরকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও অশেষ কৃতজ্ঞতা।

✿ সূচীপত্র ✿

অ. ক্র.	পাঠের নাম		সাহিত্য প্রকার	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা ক্রমাংক
১.	বাড়ির কাছে আরশীনগর	পদ্য	গীত	লালন ফকির	১
২.	শিল্পী	গদ্য	সমাজচিত্র	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
৩.	আমি দেখি	পদ্য	প্রকৃতি প্রেম	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	১৩
৪.	তোতাকাহিনী	গদ্য	রূপক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬
৫.	বর্ণমালা, আমার দু:খিনী বর্ণমালা	পদ্য	মাতৃভাষা প্রেম	শামসুর রাহমান	২১
৬.	গারো পাহাড়ের নীচে	গদ্য	ভ্রমন কাহিনী	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	২৫
৭.	নবান্ন	পদ্য	দু:খবাদ	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৩০
৮.	ভারতবর্ষ	গদ্য	একাত্মতাবোধ	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	৩৪
৯.	শিকার	পদ্য	বোধমূলক	জীবনানন্দ দাশ	৪০
১০.	ইস্পাতের মেয়ে	গদ্য	উপন্যাস অংশ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৫
১১.	রাস্তা কারও একার নয়	পদ্য	সমানতা	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৬
১২.	শুভ উৎসব	গদ্য	পার্বন	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৯

✿ বিশেষ সাহিত্য ✿

অ. ক্র.	পাঠের নাম	সাহিত্য প্রকার	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা ক্রমাংক
১৩ - অ)	আদাব	লঘুকথা	সমরেশ বসু	৬৭
- আ)	অলৌকিক	লঘুকথা	কর্তার সিং দুগ্গাল	৭২
- ই)	শ্রীপতি সামন্ত	ছোটোগল্প	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৭৫
- ঈ)	প্রতিশ্রুতি	ছোটোগল্প	আশাপূর্ণা দেবী	৭৯
	ব্যবহারিক লেখন			
১৪.	রেডিও জকি	সাক্ষাৎকার	শ্রীমতী ঋষিতা নীলাশীষ মন্ডল	৮৮
১৫.	ব্লগ লেখন	লেখ	প্রো.মঞ্জুরানী সিং	৯৪
১৬.	ফিচার লেখন	কথোপকথন	শ্রীমতী প্রিয়া রায়	৯৯
১৭.	ভাবসম্প্রসারণ	কাহিনী মূলক	শ্রী নীতিশ বিশ্বাস	১০৩

১. বাড়ির কাছে আরশীনগর

- লালন ফকির

কবি পরিচিতি

লালন ফকির ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম বাউল গানের রচয়িতা । এই সাধকের জন্মবৃত্তান্ত অনেকটাই রহস্যে ঢাকা। একটি মত অনুসারে, লালন সাঁই ১৭৭৪ সাল নাগাদ নদিয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ভাড়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দু কায়স্থ পরিবারের একমাত্র সন্তান ছিলেন লালন সাঁই। তাঁর পিতার নাম মাধব কর এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। অন্য এক মতে তাঁকে মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসেবে দেখানো হয়েছে।

শোনা যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। নিরক্ষর পল্লীবাসী হতে আরম্ভ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত লালন ফকিরের সঙ্গে ধর্মালাপ করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। আবার শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ তার সমাধীর উপরে একটি ছোট পাকা স্মৃতি মন্দির তৈরী করে দিয়েছিলেন ১৩১১ বঙ্গাব্দে। ১৮৯০ সালের ১৭ ই অক্টোবর দেউড়িয়ার আখড়াতেই ১১৬ বছর বয়সে লালন ফকির দেহত্যাগ করেন।

কবিতার মূলকথা

'আরশী' শব্দের অর্থ আয়না । আরশীনগর বলতে মনকে বুঝানো হয়েছে। মনের মধ্যেই চারপাশের জগৎপ্রতিফলিত হয়। পড়শী হলো বাউল সাধনার ঈশ্বর, যাঁকে তারা 'মনের মানুষ' বলে মনে করেন। কিন্তু বাউল সাধনায় এই পড়শীর সন্ধান পাওয়া বা তাকে লাভ করা খুব সহজ নয়। তার এই পড়শী হলো ঈশ্বর। পড়শী শুধু উপলব্ধির জগতে অবস্থান করেন। তাকে কখন ও বোঝা যায়, কখনও বোঝা যায়না। তার সন্ধান পেলে মানুষের জীবন যন্ত্রনার অবসান ঘটত।

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশীনগর
ওএক পড়শী বসত করে।
গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে -

আমি বাঞ্ছা করি দেখব তারি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে।
বলব কি সেই পড়শীর কথা

ও তার হস্ত, পদ-স্কন্ধ-মাথা নাই রে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে ।
পড়শী যদি আমায় ছুঁত

আমার যম-যাতনা যেত দূরে।
আবার সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

শব্দার্থ

আরশী = আয়না
তরণী = নৌকা
পড়শী = প্রতিবেশী
স্কন্ধ = কাঁধ
বসত = বাস
যাতনা = যন্ত্রনা
গ্রাম = গাঁ, এখানে আত্মতত্ত্ব অর্থে ব্যবহৃত
যমযাতনা = পার্থিব দু:খ শোক বা বিষয় যন্ত্রনা
যোজন = চার ক্রোশ (এক ক্রোশ বা দুই মাইলের কিছু বেশী)

অনুশীলনী

১. আকলন

অ) কারণ লেখ :-

(১) আমি এক দিনও না দেখিলাম তারে....

(২) কবির মনের মানুষের হাত-পা-মাথা নেই....

আ) ছক পূর্ণ করো :-

(১)

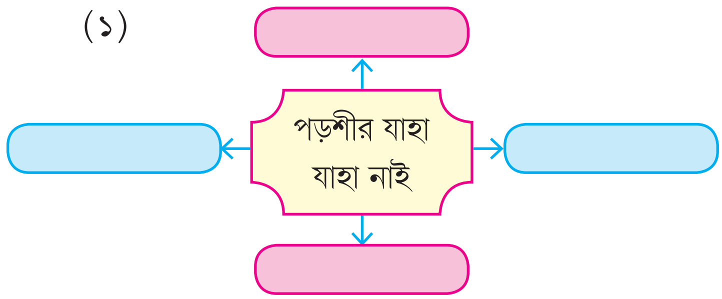

(২)

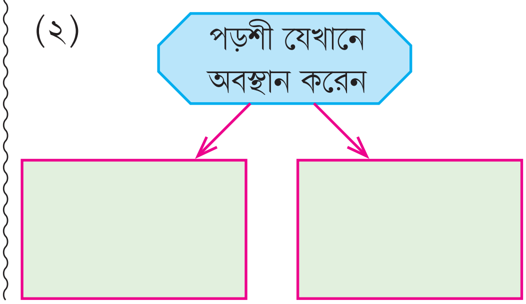

২. শব্দ সম্পদ

অ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :-

গাঁয়, ভাসা, ফাঁক, দূরে, উপর, কাছে।

আ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমার্থক শব্দ লেখ :-

বাড়ি, পড়শী, পানি, তরণী, হস্ত, পা, শির, জল

৩. কাব্যসৌন্দর্য

অ) যে পঙক্তিগুলির মাধ্যমে কবি তার মনের মানুষের অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন সেই পঙ্‌ক্তিগুলির অর্থ লেখ।

আ) যোগ্য উত্তরটি বেছে নাও :

কবি কার ছোঁয়া পেতে চান ?

১) তার আপন জনের   ২) তার বন্ধুর   ৩) তার মনের মানুষের

৪. অভিব্যক্তি

অ) ‘‘প্রতিটি মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করা উচিত।’’- এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) ‘‘নির্মল হৃদয় না হলে ঈশ্বরের সাড়া পাওয়া যায় না।’’ এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

ই) ‘‘মানুষের মাঝে ঈশ্বরকে খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন।’’ - এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৫. রসাস্বাদন

অ) বাড়ির কাছে আরশীনগর - লালনের এই গানটির মূল বক্তব্য ও তার রূপক অর্থ আলোচনা করো।

আ) ‘‘বাড়ির কাছে আরশীনগর/ ও এক পড়শী বসত করে।’’ - আরশীনগরে থাকা পড়শীর পরিচয় দাও।

ই) বাউল তত্ত্ব ভাবনার উৎপত্তি কী ভাবে হয়েছে লেখ।

ঈ) বাউল সাধক লালন ফকির কী ভাবে চিত্ত পরিশুদ্ধির কথা বলেছেন ?

৬. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) বাড়ির কাছে আরশীনগর গানে বাউল তত্ত্ব কী ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করো।

আ) কবি ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে যাহা বলেছেন তাহা লেখ।

ই) লালনের মতে যম-যাতনা কীভাবে দূর করা যেতে পারে ?

ঈ) বাড়ির কাছে আরশীনগর বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

উ) বাড়ির কাছে আরশীনগর কবিতায় বর্ণিত 'পড়শী'র স্বরূপ বর্ণনা করো।

৭. সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

অ) পড়শী দেখতে কেমন ?

আ) কবি এক দিনের জন্যও কাকে দেখতে পাননি ?

ই) কবি এই অগাধ পানি পার করতে পারছেন না কেন ?

ঈ) কাদের মধ্যে লক্ষ যোজন ফাঁক রয়েছে ?

উ) ক্ষণেক নীরে ভাসে কে ?

ঊ) লালন তার গানে 'পড়শী' বলেছেন কাকে ?

ব্যাকরণ

অলংকার

* যে গুন দ্বারা ভাষার শক্তি বা সৌন্দর্য সম্পাদন হয়, তাকে অলঙ্কার বলে।

অলঙ্কার দুই প্রকারের।

(১) শব্দগত বা ধ্বনিগত অলঙ্কার - শব্দালঙ্কার (২) অর্থগত বা ভাবগত অলঙ্কার - অর্থালঙ্কার

অর্থালঙ্কার

* শব্দের অর্থরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি তাহাদের অর্থালঙ্কার বলে। মনে রাখিতে হইবে, অর্থ ঠিক রাখিয়া শব্দ বদলাইয়া দিলেও এই জাতীয় অলঙ্কার ক্ষুন্ন হয় না।

অর্থালঙ্কারকে সাধারণ লক্ষনানুযায়ী প্রধানত: পাঁচ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) সাদৃশ্যমূলক (২) বিরোধমূলক (৩) শৃঙ্খলামূলক (৪) ন্যায়মূলক (৫) গূঢ়ার্থমূলক

* সাদৃশ্যমূলক থেকে উদাহরণ :

(১) উপমা : একই বাক্যে সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হইলে উপমা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ : মেয়েটি দিন দিন লতার মত বাড়িয়া উঠিতেছে।

(২) রূপক : উপমেয়ের সহিত উপমানের অভেদ কল্পনা করা হইলে রূপক অলঙ্কার হয়। রূপকে ক্রিয়াটি হয় উপমানের অনুযায়ী।

উদাহরণ : আমি চাই উত্তরিতে জন্ম-জলধির নিস্তরঙ্গ বেলাভূমি। ইত্যাদি।

২. শিল্পী

- মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯মে ১৯০৮। সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম মাণিক। সেটাই তিনি লেখক-নাম করে তোলেন। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এসসি পড়ার সময় প্রথম গল্প 'অতসীমামী' লেখেন । তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির-কাব্য' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরনীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে - 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'শহরবাসের ইতিকথা', 'হলুদ নদী', 'সবুজ বন', 'জননী', 'চিহ্ন', 'হরফ' ইত্যাদি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ গুলি হল 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'বউ', 'লাজুকলতা', 'পরিস্থিতি'। 'পরিস্থিতি' গল্পগ্রন্থের অষ্টম সংখ্যক গল্প হল 'শিল্পী' । ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়।

পাঠের মূলকথা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাজার দখল করে নেয় এক-শ্রেনীর স্বার্থান্বেষী কালোবাজারি ও চোরা কারবারি মানুষ। বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় বহু প্রয়োজনীয় জিনিস। তা ছাড়া এক শ্রেনীর মহাজন কৃত্রিম অভাব তৈরি করে বাজার থেকে সরিয়ে ফেলে তাঁতিদের প্রয়োজনীয় সুতো এই উদ্দেশ্যে যে, তাদের দেওয়া দাদন ও সুতো জোগানোর ব্যবস্থার ভিত্তিতে যাতে সস্তায় ধুতি-শাড়ি-গামছা প্রভৃতি তাঁতিরা বুনতে বাধ্য হয়। মিহিরবাবুর দালাল ভুবন ঘোষাল, তাঁতিপাড়ার প্রধান তাঁতি মদন কে বশে আনার চেষ্টা করলেও শেষে সফল হয় না । কথার খেলাপ করে ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত চালানোর বান্দা সে নয়। মহাজনের শোষনযন্ত্রের কাছে হার মানার মানুষ সে নয়। শ্রেনীসংগ্রামের আপসহীন যোদ্ধা সে।

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে-পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিক-মারা কামড়ানি। সুতো মেলেনা, তাঁত চলেনা, বিনা রোগে ব্যারামধরার মতো হদ্দ করে ফেলে। ঘন্টার পর ঘন্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়ন চড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিঁইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দুদিনে, রাতে ঘুম আসে না, মনটা কেমন টন টন করে এক ধরনের উদাস করা কষ্টে, সব যেন ফুরিয়ে গেছে! যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনি ধারা কষ্ট, তবে ঢের বেশী জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর মনের ও সব উদ্বেগ সয়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন।

সকালে উঠেই মা গেছে বউ কে সাথে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে, বাবুর ছোটো মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে 'দু-একখানা ভালো, মদন-তাঁতির নাম করা বিশেষ রকম ভালো কাপড় বুনে দেবার ফরমাশ যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে জোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে। বাড়িতে ছিল শুধু মদনের মাসি । তার আবার একটা হাত নুলো, শরীরটি প্যাকাটির মতো রোগা। মদনের হাঁউমাউ চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দু' বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সাথে আসে মাসির চার বছরের মেয়ে। মাসির কী ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে খিঁচধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের। মাসিও চেঁচায়। মদনের চিৎকারে ভয় পেয়ে ছেলে মেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল।

তখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা ধরে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রনাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ার বদলে বশে আসে পা-টা।

বাঁচালেন মোকে।

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘষে। খড়ি ওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায় শব্দ হয় শোষের মতো।

ভুবন পরামর্শ দেয়, উঠে হাঁটো দু'পা। সেরে যাবে।

মদন কথা কয় না। এতক্ষণে আশে পাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়ে - পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হুল্লোড় শুনে। শুধু উদি আসেনি প্রায় লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলা গাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে।

ঘর থেকেই সে তাঁতি পাড়ার মেয়ে - পুরুষের পিত্তি জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে, কী হল গো? বলি হল কী?

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়তো তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাতদিন তাঁত বন্ধ মদনের, বউটা তার ন মাস পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে, জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপি চুপি দিয়েছে কাল মদনের বউ কে, চুপি চুপি শুধিয়েছে মদনের মতি গতির কথা, সবার মতো মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কিনা মদনের । কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বউ, "যে না, একগুঁয়েমি তার কাটেনি।"

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতি মধ্যে পিসি পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বার বার সবাই তাকায় মদন আর ভুবনের দিকে দুচোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজি হল প্রায় বেগার খাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনে দিতে? মদন অস্বস্তিবোধ করে। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নি:শব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কী যন্তনা, বাপ, একদম যেন মিত্যু যন্তনা মরি আর কি। উনি এসে টেনেটুনে ঠিক করে দিলেন পাটা, বাঁচালেন মোকে।

গগন তাঁতির বেঁটে মোটা বউ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, অ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো, তাই তো বলি মোরা।

তাঁত না চালিয়ে গা-টা ঠিক নেই। তাড়া তাড়ি বলে মদন। গগন-তাঁতির বউয়ের মুখকে তার বড়ো ভয়।

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মতো। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায় লাগাও - উত্তরে একটা আম গাছের ওপাশে, যার দু-পাশের ডাল পালা দু-জনের চাল কে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম কিন্তু, শরীর তার অনেক বেশি জরাজীর্ণ। একটি তার পুরানো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আট হাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাঁতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড়ো ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতি পাড়ায় সমস্ত তাত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতি পাড়া থম থম করছে, শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িকভাবে বৃন্দাবন কে জিজ্ঞাসা করে, কখানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন ?

বৃন্দাবন যেন চমকে উঠে । এক পা পিছিয়ে যায়।

জানি না বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।

কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়।

বাঁকা মেরুদন্ড একবার সোজা করবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন, অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

ছেলেকে শুধোবেন বাবু। ও সব জানিনা কিছু আমি।

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন !

গগনের বউ বলে মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে, আমি কিছু জানিনা গো, মোর ছেলে জানে ! কত ঢং জানে বুড়ো।

বুড়ো ভোলা বলে, আহা থামো না বুনোর মা ? অত কথায় কাজ কী। যন্তনা গেছে না মদন ? মোরা তবে যাই।

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এসব কথা - এসব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, তোমার গাঁয়ের তাঁতিরা, জানো মদন, বড়ো বোকা। মদন নিজেও সাতপুরুষে তাঁতি। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গ করেই বসে, সে কথা বলতে। তাঁতি জাতটাই বোকা ।

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কী ? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয় সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, এ কী কথা ? তোমার কথা নয় বুঝাতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি,কিন্তু ওরা-

পোষায় না ওদের । সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে ? আপনি তো জানেন, বেশির ভাগ দাদন কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবা রাত্তির তাঁত চালিয়ে, মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা ? নইলে ইদিকে সে পড়তা থাকে না বাপু। কী দরে সুতো কেনা জান ? ভুবন আপশোষের শ্বাস ফেলে, থাক গে, কী করা। কত্তাকে কত বলে তোমাদের জন্য সুতো বরাদ্দ করিয়েছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কী। বুঝি তো সব, কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনমতে টিকে থাকা । নয়তো দুদিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। ভালো সময় যখন আসবে, সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে । তখন আপশোশ করবে। আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায় থাকত, নিজেরাও টিকতে।

তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গাঁট হয়ে

বসে আছে লোকটা । কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা।

মাসি এসে ঘুর ঘুর করে আশে পাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয়নি, ভূলে গেছে। মদনের পা দুটো টান হয়ে ভুবনের পিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসির আর ধৈর্য থাকে না । মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয় ।

মদন একেবারে খিঁচড়ে ওঠে, মেয়েটাকে নে না কোলে, কেঁদে মরছে? মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি?

ছেলে মেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসি পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসি। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছেই ওটা ছুতো। ছেলেপিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসিও জানে না মদনও বোঝে না। ছেলে মেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না । তাঁতের ঠকঠকি, মেয়েদের বকাবকি, ঝিঁঝির ডাকের মতো। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের । না করুক প্রণাম সে বামুনের ছেলেকে মদনের ওপর মাসির বিশ্বাস খাঁটি । রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস তৈরীর বায়না পায় মদন-তাঁতি । মদনের মায়ের সাথে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসি বুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাপ। বিয়ের সময় জালের মতো ছিষ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মশকরা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনদিন ভুলবে না মাসি। আজ অকাল, বায়না আসেনা, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্য কষ্ট হয় মাসির, ওর বাপের কথা ভেবে। মা বউ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসি ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুড়ির বেশি বয়স হত তার। মাসি তা ভালো বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশী বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুষড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতির বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে, এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো।

না থাক মদনের বাপ । মদন তো আছে।

মদনের মা বউ ফিরে আসে গুটি গুটি, পেটের ভারে মদনের বউ থপ থপ পা ফেলে হাঁটে, হাত পা তার ফুলছে কদিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরোনো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময় । এখনও পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুননের কোমল খাপি উজ্জ্বলতা সব মিলে এমন সুন্দর আছে কাপড় খানা যে অতি বিশ্রী ভাবে পরলে ও রুক্ষ জট বাঁধা চুল চোকলা ওঠা ফাটা চামড়া এ সব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

মদনের মা বিড় বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বললেই মদন খুশি হত। কিন্তু বুড়ির কি সে কান্ডজ্ঞান আছে। সামনে এসেই সে শুরু করে দেয় মদন-তাঁতির এয়োতি-বশীকরণ বসন্ত শাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি টিটকারি দিয়ে বিদেয় করার কাহিনী। ও সব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, ঠাকুমা দিদিমারা, ঝিরা আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ও সব শাড়ি।

মদন-তাঁতি! মদন-তাঁতির কাপড় ! বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন-তাঁতি।

বলল? বলল ও সব কথা? পা গুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন, বেড়েছে-বড়ো বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বউ। খুঁটি ধরে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে

যায়, ভেতর থেকে উগ্র মন্তব্য আসে, এক পয়সার মুরোদ নেই, গর্বো কত !

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মেয়েরা অমন বলে মদন, ও সব কথায় কান দিতে নেই।

তা বলে, বাবুদের বাড়ির মেয়েরাও বলে, তার মা বউও বলে, উদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতি পাড়ার অনেক মেয়েই বলে না । মদন-তাঁতিকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের পুরুষদের সঙ্গে। মদনও তাঁত বোনে, তাঁরাও তাঁত বোনে পায়ের ধুলোর যুগ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙুল গোঁপদাড়ির মধ্যে ভাঙা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে । একটা এড়ে তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের । একটু রাগ একটু হিংসার জ্বালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাবুর তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শুনেছিল এ অঞ্চলে তাঁতি-মহলে একটা কথা চলিত আছে "মদন যখন গামছা বুনবে।" গোড়ায় কথাটার মানে ভালো বোঝেনি, পরে টের পেয়েছিল, সূর্য যখন পশ্চিমে উঠবে- এর বদলে ওই কথাটা এদিকের তাঁতিরা ব্যবহার করে। সে জানে, মদন যদি তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দিতে রাজি হয় আজ, কাল তাঁতি পাড়ার বেশির ভাগ লোক ছুটে আসবে তার কাছে সুতোর জন্য। বড়ো খাম খেয়ালি এক গুঁয়ে লোকটা, এই রাগে এই হাসে, হাহুতাশ করে, এই লম্বা চওড়া কথা কয় যেন রাজা মহারাজা !

উঠবার সময় ভুবনের মনে হয় ঘর থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল।

তার পরই মাসির গলা : ও মদন, দ্যাখসে বউ কেমন করছে।

ভুবন গিয়ে উদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না । তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে। উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে । ও ছুঁড়ির বড়ো বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়তো সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বউয়ের। কী হয়েছে মদনের বউয়ের? কী হতে পারে ? গুরুতর কিছু যদি হয়...।

উদি ফেরে অনেকক্ষণ পরে। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বউয়ের শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার মূর্ছা গেছে। মনে হয়েছিল বুঝি ওই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসব-ব্যথাটাও উঠবে।

পেসব হতে গেলে মরবে মাগি এবার। একবেলা এক মুঠো ভাত পায়তো তিন বেলা উপোস । এমনি চলছে দু মাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতিকে, মরণ হয় না ?

আখায় কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে আঁটো দেহটা পর্যন্ত তার পরিচয় দেয় দুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙে না

তাই আশ্চর্য।

এখন ও গেলে না যে?

যাব । আলিস্যে লাগছে।

ভাত খাবে, মোর রাঁধা ভাত ? উদি আবদার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, তোর কথা বড়ো বিচ্ছিরি।

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন আবার যায়। সকালের পিঁড়িটা সেইখানে পড়েছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

কেমন আছে বউ?

ব্যথা উঠেছে কম কম । রক্ত ভাঙছে বেশি, ব্যথা তেমন নয়। দুগগা বুড়ি কে আনতে গেছে।

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমতো ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, ভেবে মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎ : ভালো কিছু বোনান না, একটু দামি কিছু ? সুতো নেই বুঝি?

মনটা খুশী হয়ে ওঠে ভুবনের।

সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসি ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে ?

বেনারসি? বেনারসি না বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধ:পতন এমনি আপশোষের সঙ্গে বলে মদন, বেনারসি জীবনে বুনিনি।

এক ঘন্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌঁছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভালো কাপড় বুনে দিতে হবে। এর চেয়ে কেশবের মতো গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন-তাঁতি গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি। সকালে পায়ে যেমন খিঁচ ধরেছিল তেমনি ভাবে কী যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাঁকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে তাঁত না চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্ট মতো ব্যথায় পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বার বার, বউটা গোঙাচ্ছে একটানা ।

কী করবে মদন-তাঁতি ?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে, মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুর শিয়ালের ডাক ছাড়া মদন তাঁতির তাঁত ঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক্, ঠকাঠক্। খুব জোরে তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠছে জোরে! উদির ঘরে তো বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে পর্যন্ত শব্দ পৌঁছোতে থাকে তার তাঁত চালানোর। ভুবন বলে আশ্চর্য হয়ে, এর মধ্যে তাঁত চাপাল ? একা মানুষ কখন ঠিক করল সব ?

উদিও অবাক হয়ে গিয়েছিল - ও খাঁটি গুণী লোক, ও সব পারে - সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়ো বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, মদন তাঁত চালায় নাকি রে ?

তাছাড়া কী আর ? কেশব জবাব দেয় ঝাঁজের সঙ্গে, রাত দুপুরে চুপেচুপে তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধু মোদের বেলা ।

ভুবনের সুতো না হতে পারে।

কার সুতো তবে? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি ?

মদনের তাঁত কখন থেমেছিল উদি জানে না। ভোরে ঘুম ভেঙেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে । মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, কতটা বুনলে তাঁতি?

আয় দেখবি।

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁত-ঘরে । ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

সুতো মদন উদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, নিয়ে যা ফিরে দে গা ভুবনবাবুকে।

বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে -

একটু বেলা হতে তাঁতি পাড়ার অর্ধেক মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাঁদের মনের অবস্থা। রোষে ক্ষোভে কারও চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করেছে। গগন- তাঁতির বউটা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছে।

বুড়ো ভোলা শুধোয় : ভুবনের ঠেয়ে নাকি সুতো নিয়েছ মদন ? তাঁত চালিয়েছ দুকুর রাতে চুপি চুপি ?

দেখে এস তাঁত ?

তাঁত চালাওনি রাতে ?

চালিয়েছি ! খালি তাঁত । তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এটটু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব ? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে ? মদন-তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে -

মদন হঠাৎ থেমে যায়।

শব্দার্থ

দাওয়া = বারান্দা
খিঁচ = মাংসপেশিতে টান
আড়ষ্ট = অবশ
অফুরন্ত = অশেষ
নুলো = ঠুঁটো
পোয়াতি = গর্ভবতী
জরাজীর্ণ = দুর্বল
আদ্দেক = অর্ধেক
ছুতো = অজুহাত
বাঁধা = বন্ধক
ব্যারাম = অসুখ
মুরোদ = শক্তি, ক্ষমতা
মোকে = আমাকে
ওঁচা = খুব নিকৃষ্ট মানের

অনুশীলনী

১. আকলন

অ) ছক পূর্ণ করো :-

(১)

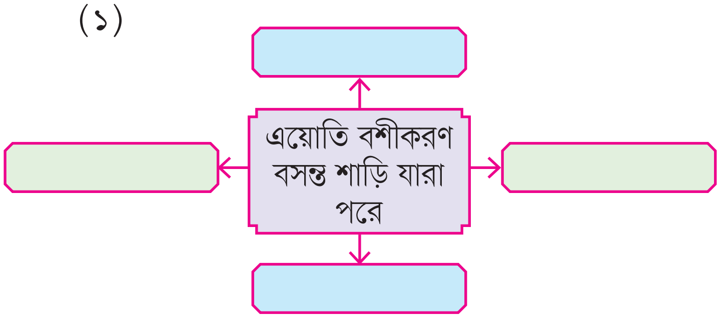

(২)

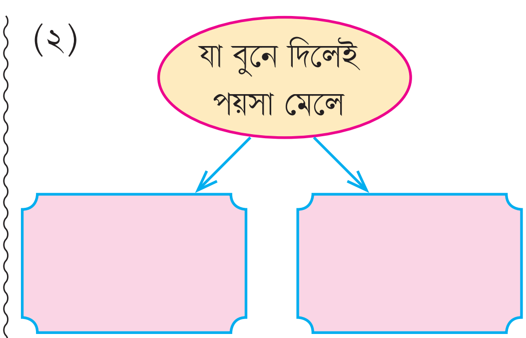

আ) কারণ লেখ :-

(১) ভুবন ঘোষাল, মদনের উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে...

(২) মদন তাঁতি খালি তাঁত চালিয়েছিল...

(৩) বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে...

২. শব্দ সম্পদ

অ) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :-**

ফুরন্ত, হাসি, নতুন, অস্পষ্ট, দামী, অধৈর্য, ছোট, কল্যাণ, কম, অক্ষমতা

আ) **ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখ :-**

টাকা পয়সা, মেয়ে-পুরুষ, সাতপুরুষ, দিবারাত্তির, ছেলে মেয়ে, তাঁতিপাড়া, ত্রিলোকী

ই) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমার্থক শব্দ লেখ :-**

ইঙ্গিত, স্বস্তি , টিটকারি, আখা, শ্যাল, মূর্ছা গর্বো, যুগ্যি

৩. অভিব্যক্তি

অ) ‘‘তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন’’-এ সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) ‘‘যন্ত্রশিল্পের আগমনে হস্তশিল্পের অবনতি ঘটেছে।’’ - এই ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৪. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) ‘শিল্পী’ গল্প অবলম্বনে তাঁতি সম্প্রদায়ের মানুষের অসহায়তার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও।

আ) মদন তাঁতি ভুবন ঘোষালের কাছে কী অনুরোধ করেছিল এবং তাহা রক্ষিত হয়েছিল কী ?

ই) বৃন্দাবন অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল কেন ?

ঈ) মদন খালি তাঁত চালিয়েছিল কেন ?

উ) ভুবন ঘোষালের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

ঊ) ‘‘একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে.’’- এর দ্বারা কী বিপদের কথা ভাবা হয়েছে ?

৫. সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

অ) মদন কত দিন তাঁত চালায়নি ?

আ) মদনের পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েছিল কে ?

ই) ভুবন ঘোষাল মদনকে কী পরামর্শ দিয়েছিল ?

ঈ) কার পায়ে হঠাৎ খিঁচ ধরেছিল ?

উ) বৃন্দাবনের শরীর কেমন ছিল ?

ঊ) কীসের অভাবে তাঁতি পাড়ার সমস্ত তাঁত বন্ধ ?

৩. আমি দেখি

- শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কবি পরিচিতি

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে নভেম্বর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহড়ুতে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁর পিতা বামানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা কমলাদেবী । ছোটোবেলায় কবি ভরতি হন কাশিম-- বাজার পলিটেকনিক স্কুলে । ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেন তিনি। তিনি 'রুপচাঁদ পক্ষী' ছদ্মনামে কবিতা লিখতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় পঞ্চাশের দশকের একজন শক্তিশালী ও জনপ্রিয় কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অনুবাদ করেছেন 'মেঘদূত', 'ওমর খৈয়াম, গালিব, লোরকা, রিলকে প্রমুখের কবিতা। 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থের জন্য পেয়েছিলেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'ছিন্নবিচ্ছিন্ন', 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই', 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো', 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি' প্রভৃতি।

কবিতার মূল কথা

'আমি দেখি' কবিতায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সবুজের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। কবি তাঁর বাগানে গাছ বসাতে বলেছেন, কারণ আরোগ্যের জন্য সবুজ খুব প্রয়োজন। বৃক্ষ নিধনের সাক্ষ্য বহন করে চলা শহরেই একঘেয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে বলে কবির আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়। নাগরিক সভ্যতার বিকাশ প্রকৃতিকে তিলে তিলে গ্রাস করছে। ফলে দেখা দিয়েছে সবুজের নিদারুণ অনটন। তাই কবির মন আকুলভাবে চায় বাগানে গাছেদের সমারোহ।

গাছগুলো তুলে আনো, বাগানে বসাও
আমার দরকার শুধু গাছ দেখা
গাছ দেখে যাওয়া
গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যের জন্যে ঐ সবুজের ভীষণ দরকার

বহুদিন জঙ্গলে কাটেনি দিন
বহুদিন জঙ্গলে যাইনি
বহুদিন শহরেই আছি
শহরের অসুখ হাঁ করে কেবল সবুজ খায়
সবুজের অনটন ঘটে...

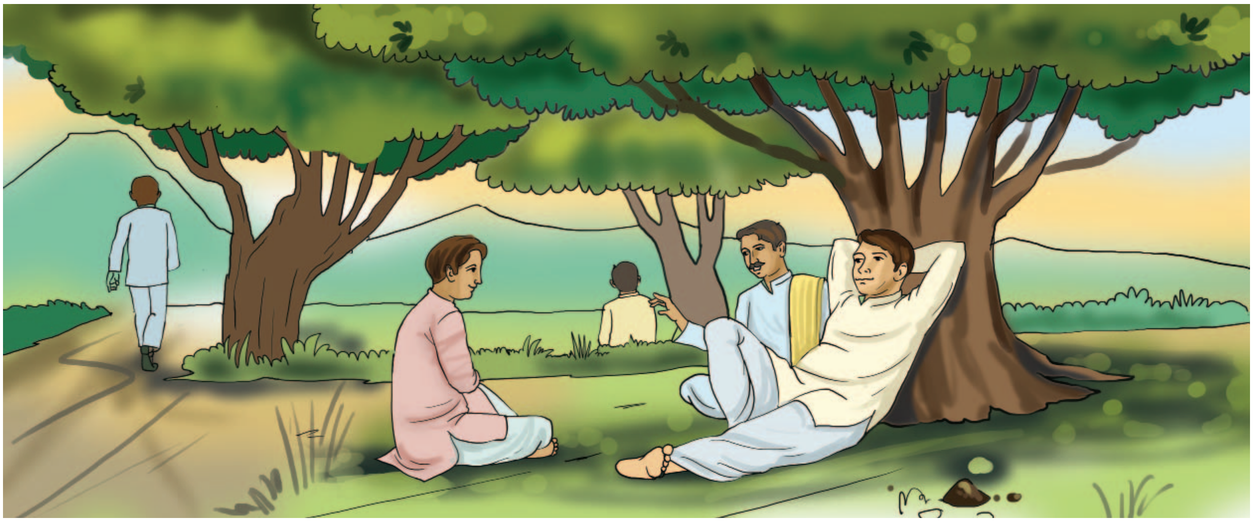

তাই বলি, গাছ তুলে আনো
বাগানে বসাও আমি দেখি
চোখ তো সবুজ চায় !
দেহ চায় সবুজ বাগান
গাছ আনো, বাগানে বসাও !
আমি দেখি ।।

শব্দার্থ

আরোগ্য = রোগমুক্তি	ভীষণ = খুব	জঙ্গলে= বনে
অনটন = অভাব	দরকার = প্রয়োজন	বহুদিন = দীর্ঘদিন

অনুশীলনী

১. আকলন

নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করো :-

অ) ছক পূর্ণ করো :-

কবির চোখ আর দেহ চায়

আ) কারণ লেখ :-

(১) সবুজের ভীষণ দরকার ... (২) গাছগুলো তুলে বাগানে বসাও...

(৩) সবুজের অনটন ঘটে...

২. কাব্যসৌন্দর্য

অ) যে পঙক্তিগুলির মাধ্যমে, কবি সবুজের ভীষন প্রয়োজনের কথা বলেছেন, সেই পঙক্তিগুলির অর্থ লেখ।

আ) যোগ্য উত্তরটি বেছে নাও :

শহরের অসুখ হাঁ করে কি খায় ?

১) পাথর ২) সবুজ ৩) মাটি

৩. অভিব্যক্তি

অ) 'গাছ পালা মানুষের প্রকৃত বন্ধু'- এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) 'নাগরিক সভ্যতা' বিকাশের কারণে বন ধ্বংস হচ্ছে'- এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৪. রসাস্বাদন

অ) 'আমি দেখি' কবিতায় কবির মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখ।

আ) 'আমি দেখি' কবিতার মূল্য অপরিসীম' - ব্যাখ্যা করো।'

ই) 'আমি দেখি' কবিতার বাচন ভঙ্গি সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।'

ঈ) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অরণ্য প্রীতি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী ?

৫. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) 'সবুজের অনটন ঘটে'- কেন ? সবুজের অনটন কীভাবে দূর করা যায় বলে কবি বলেছেন ?

আ) 'শহরের অসুখ হাঁ করে কেবল সবুজ খায়' - হাঁ করে তার সবুজ ... খাওয়ার তাৎপর্য কী তাহা লেখ.

ই) 'দেহ চায় সবুজ বাগান' - কার দেহ কেন সবুজ বাগান চায় তাহা 'আমি দেখি' কবিতা অবলম্বনে লেখ।

৬. সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

অ) শহরের অসুখ কী ?

আ) 'সবুজের অনটন' ঘটে কেন ?

ই) কার শুধু গাছ দেখা দরকার ?

ঈ) আরোগ্যের জন্য কী দরকার ?

উ) চোখ কী চায় ?

ঊ) কবি কোথায় গাছ বসানোর কথা বলেছেন ?

৪. তোতাকাহিনী

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক অসাধারণ প্রতিভাবান কবি। কবি হিসেবে তিনি বিশ্বখ্যাতির অধিকারী হলেও সাহিত্যের সকল শাখাতেই তিনি অসাধারণ সৃজনশীলতার বিস্ময়কর স্বাক্ষর রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতার জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ৭ ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদাদেবী । স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা না হলেও বিভিন্ন গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাড়িতে তাঁর অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের কাজ চলতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার'। 'বনফুল', 'কবি কাহিনী', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'শৈশব সংগীত' ইত্যাদি প্রথম জীবনের রচনা।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ বৎসল কবি। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। ছোটোগল্প ও উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। কয়েক খন্ডে বিভক্ত 'গল্পগুচ্ছ' ছাড়া 'রাজর্ষি', চোখের বালি', 'গোরা' 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি উপন্যাস উল্লেখ্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ হয় ৭ ই আগস্ট ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে।

পাঠের মূলকথা

ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষার ব্যর্থতা কবির শিক্ষা বিষয়ক লেখায় বারবার প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন নীরস গ্রন্থ সর্বস্ব শিক্ষাবিধি ও কেরানি গড়ার লক্ষ্যে গড়ে তোলা শিক্ষা ব্যবস্থা কখনও জাতীয় কল্যাণের সহায়ক হতে পারে না। তখনকার শিক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন না হয়ে ইংরেজী ভাষা বাহন হওয়ায় তার কুফলের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় ও ভাষণে বারবার উল্লেখ করেছেন।

এক-যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ । সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না । লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, ''এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজ হাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, ''পাখিটাকে শিক্ষা দাও।''

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার। পন্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশী ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজ পন্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশবিদেশের

লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, ‘‘শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।’’ কেহ বলে, ‘‘শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল।’’

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পন্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, ‘‘অল্প পুঁথির কর্ম নয়।’’

ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা, পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বত প্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, ‘‘শাবাশ। বিদ্যা আর ধরেনা।’’

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল. বলদ বোঝাই করিয়া তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, ‘‘উন্নতি হইতেছে।’’

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল। তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, ‘‘খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখেনা।’’

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘‘ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।’’

ভাগিনা বলিল, ‘‘মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পন্ডিতদের, লিপিকরদের ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়া মন্দ কথা বলে।’

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিস্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘন্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরী দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পন্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, ‘‘মহারাজ, কান্ডটা দেখিতেছেন!’’ মহারাজ বলিলেন, ‘‘আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।’’ ভাগিনা বলিল, ‘‘শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।’’ রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, ‘‘মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি?’’

রাজার চমক লাগিল, বলিলেন ‘‘ঐ যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।’’

ফিরিয়া আসিয়া পন্ডিতকে বলিলেন, ‘‘পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।’’

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না, মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

পাখিটা মরিল। কোন্ কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, ‘‘পাখি মরিয়াছে।’’

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, ‘‘ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।’’

এবার রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা - সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়। পাখিটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর-মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলায় আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্ করে। এমন-কি, এক একদিন দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, ‘‘এ কী বেয়াদবি।’’

তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল,‘‘পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘‘এ রাজ্যের পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।’’

তখন পন্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কান্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

ভাগিনা বলিল, ‘‘মহারাজ পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।’’ রাজা শুধাইলেন,‘‘ও কি আর লাফায়।’’

ভাগিনা বলিল, ‘‘আরে রাম !’’

‘‘আর কি ওড়ে।’’

‘‘না।’’

‘‘আর কি গান গায়।’’

‘‘না।’’

‘‘দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।’’

‘‘না।’’

রাজা বলিলেন, ‘‘একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।’’ পাখি আসিল, সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল।’’ রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

শব্দার্থ

মূর্খ = বোকা, মূঢ়
স্যাকরা = স্বর্ণকার
খবরদারি = দেখভাল / সতর্কতা
নিন্দুক = নিন্দা করাই যার স্বভাব
শিরোপা = রাজসম্মান প্রাপ্তি
কিশলয়গুলি = গাছের নতুন পাতাগুলি
জগঝম্প = উল্লাস প্রকাশ করার এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র / জয়ঢাক
বালাখানায় = ইটের তৈরি একের বেশি তলবিশিষ্ট চকমিলানো বাড়ি
কায়দাকানুন = রীতিনীতি
তলব = আহ্বান, ডাকা
ঘটা = আড়ম্বর
তদারক = দেখভাল
কাড়ানাকাড়া= একপ্রকার বাদ্য যন্ত্র
অবিদ্যা = বিদ্যা বা জ্ঞানের অভাব
লিপিকর = পুঁথি নকল করে যারা
তনখা = মাইনে
বেয়াদবি = অভদ্রতা

অনুশীলনী

১. আকলন

অ) ছক পূর্ণ করো :-

(১)

(২)

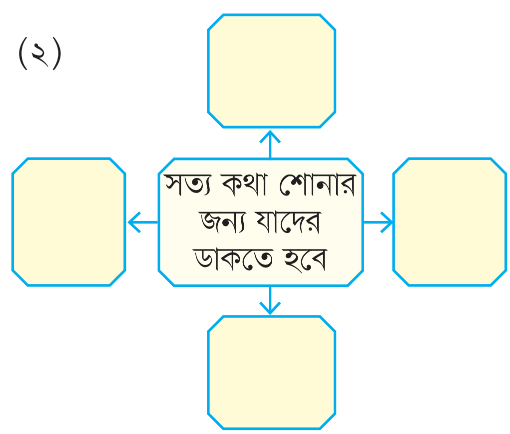

(৩)

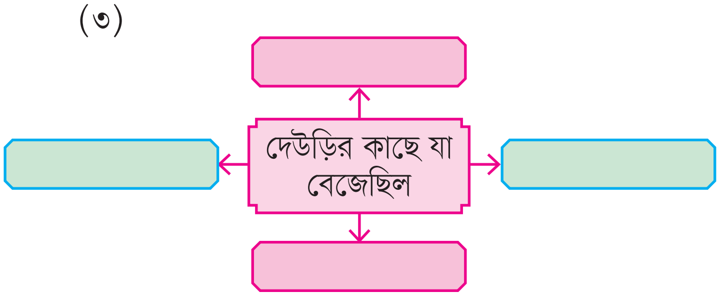

(৪)

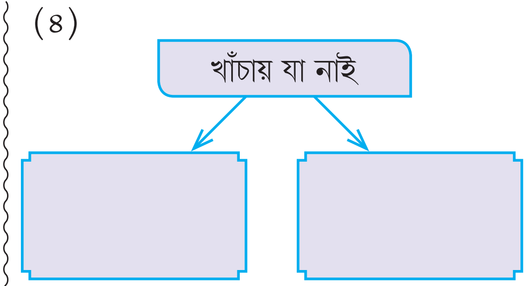

আ) কারণ লেখ :-

(১) রাজ পন্ডিতেরা খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন...

(২) লিপিকরদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না...

(৩) নিন্দুকগুলো মন্দ কথা বলে...

(৪) ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল...

(৫) পাখিটাকে দেখাই যায় না...

২. শব্দ সম্পদ

অ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :-

ভালো, প্রশ্ন, অখুশি, বিদ্যা, কম, অবনতি, প্রজা।

আ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমার্থক শব্দ লেখ :-

আকুল, দেউড়ি, কায়দা, লাঠি, সন্ত্রী, চমক, শিষ্ট।

ই) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো :-

যথেষ্ট, পরস্পর, বারেক, স্বেচ্ছা, প্রত্যক্ষ, রামেশ্বর, রবীন্দ্র, স্বল্প, প্রত্যেক।

৩. অভিব্যক্তি

অ) 'মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিৎ'- এই বিষয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) 'বিদ্যার্থীদের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষকের ধর্ম'- এই বিষয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করো।

ই) 'শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ করা'- এই বিষয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করো।

৪. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) 'খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।' - বক্তার এরূপ উক্তির কারণ কী তাহা লেখ।

আ) কোন কালে কারা কী ঠাহর করতে পারে নি ?

ই) কার পেটের মধ্যে পুঁথির পাতা খসখস করতে লাগল ও কেন ?

ঈ) রাজা কেন হঠাৎ তোতাকে শিক্ষিত করে তোলার মনস্থির করলেন ?

উ) তোতা পাখিটাকে শিক্ষিত করে তোলার গুরুদায়িত্ব কাদের উপর দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের চেষ্টায় পাখিটি শিক্ষিত হতে পেরেছিল কী ?

৫. সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

অ) সোনার খাঁচা বানাইতে বসিয়াছিল কে ?

আ) কাদের সংসারে টানাটানি রহিল না ?

ই) কার গলায় সোনার হার চড়িল ?

ঈ) ঝোপের মধ্যে কারা ছিল ?

উ) কার ডানা কাটা গেল ?

ঊ) নিন্দুক লক্ষ্মী ছাড়া কী রটাইয়াছিল ?

৫. বর্ণমালা, আমার দু:খিনী বর্ণমালা

- শামসুর রাহমান

কবি পরিচিতি

কবি শামসুর রাহমানের জন্ম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মাহুতটুলিতে ২৪ শে অক্টোবর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। পিতা আলহাজ্জ মুলখেসুর রাহমান চৌধুরী এবং মাতা মোসাম্মত আমেনী বেগম। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। শামসুর রাহমান পেশায় সাংবাদিক। অবশ্য সাহিত্য সাধনা ছিল তাঁর নেশা। তিনি কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, শিশুও কিশোর সাহিত্যে দক্ষতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেও তাঁর মুখ্য পরিচয় তিনি একজন কবি।

তাঁর রচিত কাব্যসম্ভার বিশাল। 'প্রথমগান', 'দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'নিজবাসভূমে', 'বন্দি শিবির থেকে', 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে', 'এক ফোঁটা কেমন অনল', প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। 'বর্ণমালা, আমার দু:খিনী বর্ণমালা' কবিতাটি 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

কবিতার মূলকথা

কবির প্রিয় বর্ণমালা তাঁর কাছে যেন অক্ষিগোলকের মধ্যবর্তী আঁখিতারা। বর্ণমালা কবির আজন্মের সাথি। আঁখিতারা জাগরণের প্রতীক হয়ে থাকে যুদ্ধে, মহামারিতে বর্ষায়, অনাবৃষ্টিতে, ঘৃনায়, ধিক্কারে সর্বক্ষণ। মাতৃভাষাকে নিয়ে নানা নোংরামি আর অবমাননায় কবিচিত্ত ব্যথিত। তাঁর প্রিয় বর্ণমালার ওই অবহেলিত উপেক্ষিত দীনদু:খিনী মুখের দিকে তাকালে কবি-হৃদয় হয় ব্যথাতুর।

নক্ষত্র পুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।
মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড় ঘিরে রয় সর্বদাই।
কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে শিউলি-শৈশবে 'পাখি সব করে রব' বলে
মদনমোহন তর্কালংকার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক।
তুমি আর আমি, অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর মমতায় লীন, ঘুরেছি কাননে তাঁর নেচেনেচে,
যেখানে কুসুম-কলি সবই ফোটে, জোটে অলি ঋতুর সংকেতে।
আজন্ম আমার সাথি তুমি,
আমাকে স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গড়ে পলে পলে, তাইতো ত্রিলোক আজ সুনন্দ
জাহাজ হয়ে ভেড়ে আমারই বন্দরে।
গলিত কাচের মতো জলে ফাৎনা দেখে রঙিন মাছের আশায় চিকন ছিপ ধরে গেছে
বেলা। মনে পড়ে, কাঁচি দিয়ে নকশা কাটা কাগজ এবং বোতলের ছিপি ফেলে সেই
কবে আমি 'হাসিখুশি'র খেয়া বেয়ে পৌঁছে গেছি রত্নদ্বীপে কম্পাস বিহনে।

তুমি আস, আমার ঘুমের বাগানেও
হে কোন বিশাল
গাছের কোটর থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে আস,
আস কাঠবিড়ালির রূপে,
ফুল্ল মেঘমেলা থেকে চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো ঐরাবত সেজে,
সুদূর পাঠশালার একান্নটি সতত সবুজ
মুখের মতোই দুলে দুলে ওঠো তুমি
বার বার কিংবা টুকটুকে লংকাঠোট টিয়ে হয়ে
কেমন দুলিয়ে দাও স্বপ্নময়তায় চৈতন্যের দাঁড় ।
আমার এ অক্ষিগোলকের মধ্যে তুমি আঁখিতারা ।
যুদ্ধের আগুনে
মারির তান্ডবে,
প্রবল বর্ষায়
কী অনাবৃষ্টিতে,
বারবনিতার
নূপুর নিক্বনে,
বনিতার শান্ত
বাহুর বন্ধনে,
ঘৃনায় ধিক্কারে,
নৈরাজ্যের এলো-
ধাবাড়ি চিৎকারে,
সৃষ্টির ফাল্গুনে
হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।
তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার ?
উনিশ শো বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী ।
সে-ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে ।
এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি,
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস !
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো, বর্ণমালা, আমার দু:খিনী বর্ণমালা ।

শব্দার্থ

বর্ণমালা = বর্ণের সমষ্টি
নিবিড় = ঘন
সত্তা = অস্তিত্ব
সর্বদা = সর্বক্ষণ
লীন = একাকার
উন্মীলিত = বিকশিত
মহীয়সী = মহীয়ান এমন স্ত্রী
খেঙরা = ঝাঁটা
মারি = মড়ক
চৈতন্য = জ্ঞান, চেতনা

অনুশীলনী

১. আকলন

নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করো :-

অ) ছক পূর্ণ করো :-

(১)

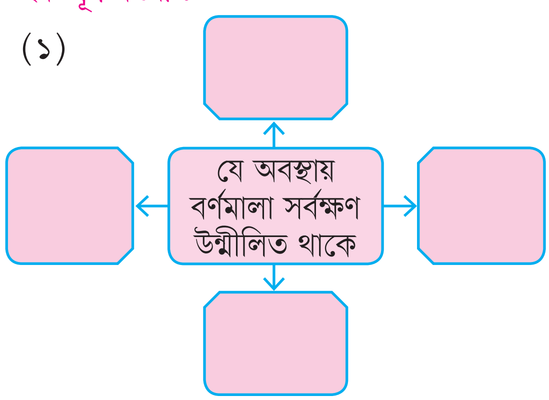

(২)

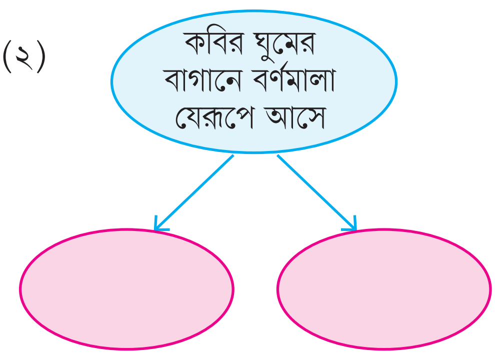

আ) কারণ লেখ :-

(১) তোমার মুখের দিকে আজ আর তাকানো যায় না...

(২) তুমি আমার আজন্মের সাথি...

২. শব্দ সম্পদ

অ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখ :-

রাত, অবিচ্ছিন্ন, আশায়, আস, শান্ত, আজ।

৩. কাব্যসৌন্দর্য

অ) যে পঙক্তিগুলির মাধ্যমে কবি তাঁর প্রিয় বর্ণমালাকে অক্ষিগোলকের মধ্যে আঁখিতারা বলে সম্বোধন করেছেন সেই পঙক্তিগুলির অর্থ লেখ।

আ) যোগ্য উত্তরটি বেছে নাও :-

কবি কিসের খেয়া বেয়ে রত্নদ্বীপে পৌঁছে গেছেন ?

১) নৌকা বেয়ে　　২) হাসিখুশির খেয়া বেয়ে　　৩) বাঁশের খেয়া বেয়ে

৪. অভিব্যক্তি

অ) ‘মা এবং মাতৃভূমির স্থান স্বর্গেরও উর্দ্ধে’ - এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) ‘মাতৃভাষা, মায়ের দুগ্ধস্বরূপ’ এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

ই) ‘মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত’- এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৫. রসাস্বাদন

অ) বর্ণমালা আমার দু:খিনী বর্ণমালা’ কবিতার মাধ্যমে মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ ও নিবিড় ভালোবাসা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে ?

আ) কবি তার প্রিয় বর্ণমালাকে দু:খিনী বলেছেন কেন তাহা আলোচনা করো।

ই) বর্ণমালা কীভাবে কবির জীবনে উন্মীলিত থাকে তাহা আলোচনা করো ?

ঈ) ‘তোমার মুখের দিকে আজ আর যায়না তাকানো’- কবি বর্ণমালাকে উদ্দেশ্য করে কেন এ কথাগুলি বলেছেন ?

৬. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) কবি বর্ণমালাকে আজন্মের সাথী বলেছেন কেন তাহা আলোচনা করো ?

আ) কবি কীভাবে কম্পাস বিহনে রত্নদ্বীপে পৌঁছে যান তাহা লেখ।

ই) ‘বর্নমালাকে কবি আঁখি তারা বলেছেন কেন ?

ঈ) ‘সে ফুলের একটি পাপড়ি ছিন্ন হলে’- এ কথাগুলি দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

৭. সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

অ) কবির আজন্মের সাথি কে ?

আ) বর্ণমালা কাকে স্বপ্নের সেতু গড়ে দিয়েছিল ?

ই) অক্ষিগোলকের আঁখিতারা কে ?

ঈ) কবি কাকে দু:খিনী বলেছেন ?

উ) কত সালের দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলির কথা বলা হয়েছে ?

৬. গারো পাহাড়ের নীচে

- সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মা ছিলেন যামিনী দেবী। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার মেট্রোপলিটন স্কুলে তাঁকে ভরতি করা হয়। পরে তিনি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এ এবং ১৯৪১ খিস্টাব্দে 'কবিতা ভবন' থেকে বি.এ.পাশ করেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'কথিকা'. নামে একটি গদ্য। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক'। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা হল- 'অগ্নিকোণ', 'চিত্রকূট', ফুল ফুটুক', 'কাল মধুমাস', 'যতই দূরেই যাই', 'ছেলে গেছে বনে'।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে পেয়েছিলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

পাঠের মূলকথা

ভ্রমন কাহিনীকার সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিশোর-কিশোরী পাঠকদের রচনার প্রথমেই জানিয়েছেন যে, চৈত্রমাসে ময়মনসিংহে গিয়ে রাতের বেলায় উত্তরদিকের আকাশে তাকালে দেখা যাবে ধোঁয়াটে মেঘে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ওটা আদৌ মেঘ নয় গারো পাহাড়। গারো পাহাড়ের বাসিন্দারা প্রতিবছর চৈত্রমাসে গারো পাহাড়ের শুকনো ঝোপঝাড়ে একদিন আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন পাহাড়ের মানুষগুলি মনের সুখে শিকার করে। গারো পাহাড়ের চাষীরা জমিদারকে খাজনা দিতে গিয়ে নি:স্ব হয়ে যায় । জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহ করে । শেষে জমিদারের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে থেকেও এই মানুষগুলো মনে প্রাণে বাঙালি হয়ে উঠেনি। যার জন্য দায়ী অবশিষ্ট বাঙালি সমাজ । আমরা ওদের দূরে সরিয়ে রেখেছি, আপন করে নিইনি।

চৈত্র মাসে যদি কখনও ময়মনসিংহ যাও, রাত্তিরে উত্তর শিয়রে তাকাবে । দেখবে যেন একরাশ ধোঁয়াটে মেঘে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ভয় পাবার কিছু নেই, আসলে ওটা মেঘ নয়, গারো পাহাড়।

গারো পাহাড়ে যারা থাকে, বছরের এই সময়টা তারা চাষবাস করে। তাদের হাল নেই, বলদ নেই- তাছাড়া পাহাড়ের ওপর তো শুধু গাছ পাথর। মাটি কোথায় যে চাষ করবে? তবু ফসল ফলায়-। নইলে সারা বছর কী খেয়ে বাঁচবে ? তাই বছরে এমনি সময়ে শুকনো ঝোপে ঝাড়ে তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। সে কি যে-সে আগুন ? যেন রাবণের চিতা- জ্বলছে তো জ্বলছেই। বছরের এমনি সময় যেন বন জঙ্গলের গাছ পালারাও ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। জঙ্গলে যখন আগুন লাগে তখন হয় মজা। বনের যত দুর্ধর্ষ জানোয়ার প্রাণ নিয়ে পালাই-পালাই করে।

বাঘ-অজগর, হরিণ-শুয়োর যে যেদিকে পারে ছোটে। আর পাহাড়ি মেয়ে - পুরুষরা সেই সুযোগে মনের সুখে হরিণ আর শুয়োর মারে। তারপর সন্ধেবেলা শিকার সেরে গোল হয়ে ঘিরে নাচ আর গান।

এদিকে আস্তে আস্তে গোটা বন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাথরের ওপর পুরু হয়ে পড়ে কালো ছাইয়ের পলেস্তারা, তার ওপর বীজ ছড়াতে যা সময়। দেখতে দেখতে সেই পোড়া জমির ওপর সবুজ রং ধরে - মাথা চাড়া দেয় ধান, তামাক, আর কত ফসল।

আমরা এই লোকগুলোর এত কাছে থেকেও পর, শুধু জানি, উত্তর দিকের আকাশটা বছরের শেষে দপ্ করে জ্বলে ওঠে-দূরের আশ্চর্য মানুষগুলো তারপর কখন যে মেঘের রঙে মিলিয়ে যায় তার খবরও রাখি না।

কাছাকাছি গিয়েছিলাম একবার।

গারো পাহাড়ের ঠিক নীচেই সুসং পরগনা। রেললাইন থেকে অনেকটা দূরে। গাড়ি যাবার যে রাস্তা সে রাস্তায় যদি কখনও যাও কান্না পাবে। তার চেয়ে হেঁটে যেতে অনেক আরাম ।

সুসং শহরের গা দিয়ে গেছে সোমেশ্বরী নদী। শীতকালে দেখতে ভারি শান্তশিষ্ট - কোথাও কোথাও মনে হবে হেঁটেই পার হই। কিন্তু যেই জলে পা দিয়েছ, অমনি মনে হবে যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্রোত তো নয়, যেন কুমিরের দাঁত । পাহাড়ি নদী সোমেশ্বরী- সর্বদা যেন রেগে টং হয়ে আছে।

তার চেয়ে ফেরি আছে, গোরু-ঘোড়া-মানুষ একসঙ্গে দিব্যি আরামে পার হও। হিন্দুস্থানি মাঝির মেজাজ যদি ভালো থাকে, তোমার কাছ থেকে দেশবিদেশের হালচাল জেনে নেবে। হয়তো গর্ব করে বলবে, তার যে বিহারি মনিব, বাংলার সব ফেরিঘাটেরই সে মালিক।

পাহাড়ের নীচে যারা থাকে, তারা আমাদেরই মতো হাল-বলদ নিয়ে চাষ-আবাদ করে। মুখচোখে তাদের পাহাড়ি ছাপ। হাজং-গারো-কোচ-ডালু-মার্গান এমনি সব নানা ধরনের জাত। গারোদের আলাদা ভাষা, হাজং ডালুদের ভাষা যদিও বাংলা, কিন্তু তাদের উচ্চারণ আমাদের কানে একটু অদ্ভুত ঠেকে। 'ত'-কে তারা 'ট' বলে, 'ট'কে 'ত', আবার 'ড'-কে তারা 'দ' বলে 'দ'-কে 'ড'। প্রথম শুনলে ভারি হাসি পাবে। ভাবো তো, তোমার কাকার বয়সের একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক দুধকে ডুড বলছে, তামাককে টামাক।

এ অঞ্চলের গারোদের ঘর দূর থেকে দেখলেই চেনা যায়। মাচা করে ঘর বাঁধা। মাচার ওপরে যেখানেই শোয়া, সেখানেই রান্নাবান্না সবকিছু। হাঁসমুরগিও এই উচ্চাসনেই থাকে। এটা হচ্ছে পাহাড়ি স্বভাব। বুনো জন্তু জানোয়ারের ভয়েই এই ব্যবস্থা।

এ অঞ্চলের হাজংরাই সব চেয়ে বেশি। 'হাজং' কথার মানে নাকি 'পোকা'। তাদের মতে, পাহাড়তলীর এই অঞ্চলে হাজংরাই প্রথম আসে, আর তখন চাষবাসে তাদের জুড়ি নাকি আর কেউ ছিল না। পাহাড়ি গারোরা তাই তারিফ করে তাদের নাম দিয়েছে হাজং - অর্থাৎ চাষের পোকা।

ধানের খেত দেখলে কথাটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই । একটু কষ্ট করে যদি পাহাড়ে না হোক একটা টিলার ওপরেও ওঠো নীচের দিকে তাকালে দেখবে পৃথিবীটা সবুজ। যতদূর দেখা যায় শুধু ধান আর ধান একটা সীমাহীন নীল সমুদ্র যেন আহ্লাদে হঠাৎ সবুজ হয়ে গেছে।

এত ফসল, এত প্রাচুর্য তবু কিন্তু মানুষগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় জীবনে তাদের শান্তি নেই। একটা দুষ্ট শনি কোথাও কোনো আনাচে যেন লুকিয়ে আছে। ধান কাটার সময় বাড়ির মেয়েপুরুষ সবাই কাস্তে নিয়ে মাঠে ছুটবে, পিঠে আঁটি-বাঁধা ধান নিয়ে

ছোটো ছোটো ছেলের দল কুঁজো হয়ে খামারে জুটবে। কিন্তু মাঠ থেকে যা তোলে, তার সবটা ঘরে থাকে না। পাওনাগন্ডা আদায় করতে আসে জমিদারের পাইক- বরকন্দাজ। তখন তারা গালে হাত দিয়ে যেন বলে,

বড়োই ধাঁধায় পড়েছি মিতে-
ছেলেবেলা থেকে রয়েছি গ্রামে,
বারবার ধান বুনে জমিতে
মনে ভাবি বাঁচা যাবে আরামে ।
মাঠ ভরে যেই পাকা ফসলে
সুখে ধরি গান ছেলেবুড়োতে ।
একদা কাস্তে নিই সকলে।
লাঠির আগায় পাড়া জুড়োতে
তারপর পালে আসে পেয়াদা
খালি পেটে তাই লাগছে ধাঁধা।।

গাঁয়ের আলবাঁধা রাস্তায় লোহার-খুর-লাগানো নাগরায় শব্দ হয় খট খটাখট - দূর থেকে বাঁশের মোটা লাঠির ডগা দেখা যায়। ছোটো ছোটো ছেলের দল ভয়ে মায়ের আঁচল চেপে ধরে । খিট খিটে বুড়িরা শাপমুন্নি দিতে থাকে। জমিদারকে টঙ্ক দিতে গিয়ে চাষিরা ফকির হয়।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এ অঞ্চলে জমিদারের একটা আইন ছিল- তাকে বলা হত হাতিবেগার। জমিদারের বেজায় শখ হাতি ধরার । তার জন্যে পাহাড়ে বাঁধা হবে মাচা। মাচার ওপর সেপাই সান্ত্রী নিয়ে নিরিবিলিতে বসবেন জমিদার, সেই সঙ্গে পান থেকে চুন না খসে তার ঢালাও ব্যবস্থা। আর প্রত্যেক গাঁ থেকে প্রজাদের আসতে হবে নিজের নিজের চালচিঁড়ে বেঁধে। যে জঙ্গলে হাতি আছে, সেই জঙ্গলে বেড় দিয়ে দাঁড়াতে হবে। ছেলে হোক বুড়ো হোক কারো মাপ নেই । যারা হাতি বেড় দিতে যেত, তাদের কাউকে সাপের মুখে কাউকে বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হত।

মানুষ কতদিন এসব সহ্য করতে পারে ? তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। গোরাচাঁদ মাস্টার হলেন তাদের নেতা। চাকলায় চাকলায় বসল মিটিং কামারশালায় তৈরি হতে লাগল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র । শেষ পর্যন্ত জমিদারের পল্টনের হাতে প্রজাদের হার হল। কিন্তু হাতি-বেগার আর চলল না।

এখনও চৈতননগরে, হিঙুল কোনায় গেলে খগ মোড়ল, আমুতো মোড়লের বংশধরদের মুখে বিদ্রোহের গল্প শোনা যায়। থুরথুরে বুড়ো যারা, তারা দুখ্যু করে বলে, সেকালে সর্ষের খেতে আমরা লুকোচুরি খেলতাম, মাঠে এত ধান হত যে কাকপক্ষীরও অরুচি ধরত। গোয়ালে থাকত ষাট-সত্তরটা গোরু, নর্দমায় দুধ ঢালাই হত। আর এখন ? এক ফোঁটা দুধের জন্যে পরের দুয়োরে হাত পাততে হয়।

একটা কথা আগে থেকে বলে রাখি। ও-অঞ্চলে যদি কখনও যাও, ওরা তোমাকে ‘বাঙাল’ বলবে। চটে যেয়ো না যেন। বাঙাল মানে বাঙালি । বাংলাদেশে থাকলেও ওদের আমরা আপন করে নিইনি - তাই ওরাও আমাদের পর-পর ভাবে।

অথচ আমরা সবাই বাংলাদেশেরই মানুষ।

শব্দার্থ

দুর্ধর্ষ = ভয়ংকর	শিয়রে = মাথার দিকে	পরগনা = গ্রামের সমষ্টি
পলেস্তারা = আবরণ	দিব্যি = চমৎকার	ধোঁয়াটে = ধোঁয়াযুক্ত
জুড়ি = সমতুল্য	বুনো = বন্য	পেয়াদা = লাঠিধারী গ্রামরক্ষক
বরকন্দাজ = বন্দুকধারী দেহরক্ষক		ধাঁধা = জটিল সমস্যা
নাগরা = একপ্রকার জুতা	বেগার = বিনা পয়সায় কাজ	
খামার = শস্য রাখবার স্থান	থুরথুরে = অতিবয়স্কও কম্পমান	
মোড়ল = গ্রাম প্রধান	শাপমুন্নি = অভিশাপাদি	

অনুশীলনী

১. আকলন

নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করো :-

অ) ছক পূর্ন করো :-

(১)

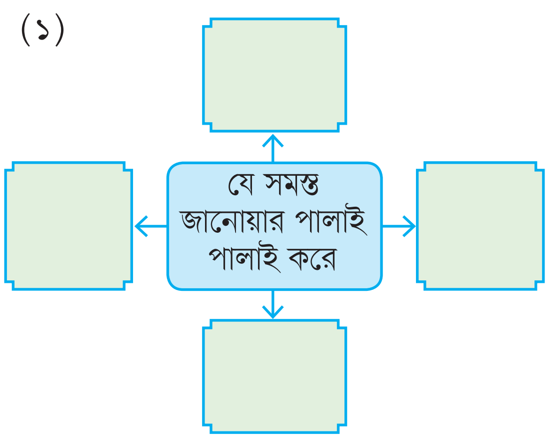

(২)

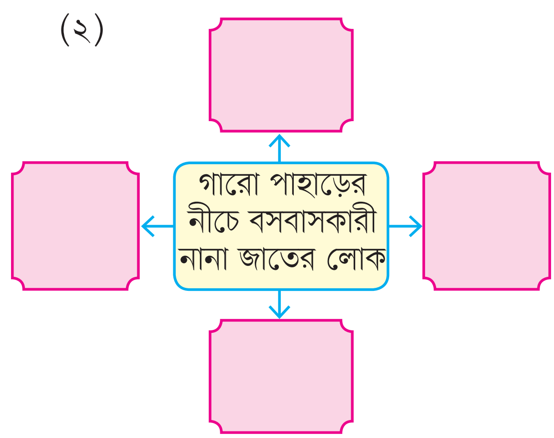

আ) কারণ লেখ :-

(১) গারো পাহাড়ের বাসিন্দারা শুকনো ঝোপে ঝাড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়...

(২) প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল...

(৩) গারো অঞ্চলের মানুষদের মনে শান্তি ছিল না...

২. শব্দ সম্পদ

অ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমার্থক শব্দ লেখ :-

তারিফ, ঠেকে, কাস্তে, পালে, বেজায়, সান্ত্রি, পল্টন, শখ।

আ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ : :-

কান্না, বিশ্বাস, সীমাহীন, খালি, রুচি, হার, মনিব

৩. অভিব্যক্তি

অ) 'বনে আগুন লাগলে পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি হয়' এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত' - এই ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

ই) গ্রাম্য লোকেরা শহরের দিকে আকর্ষিত হয়। - এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৪. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) গারো পাহাড়ের নীচে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রা বর্ণনা করো।

আ) হাতিবেগার প্রথাটি কেমন ছিল ? এই প্রথার অবসান ঘটল কী ভাবে ?

ই) গারো পাহাড় অঞ্চলের প্রজাদের মনে শান্তি থাকে না কেন ?

৫. সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

অ) জঙ্গলে যখন আগুন লাগে তখন কী হয় ?

আ) সুসং পরগনা কোথায় ?

ই) মাচা করে ঘর বাঁধে কারা ?

ঈ) পাওনাগন্ডা আদায় করতে কারা আসে ?

উ) কার হাতে প্রজাদের হার হল ?

ঊ) দুধ ঢালাই হতো কেথায় ?

৭. নবান্ন

- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি পরিচিতি

কবি যতীন্দ্রনাথের জন্ম বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে মামার বাড়িতে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল নদিয়া জেলার হরিপুর গ্রামে। পিতা দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত। মা মোহিত কুমারী দেবী। যতীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় নদিয়ার হরিপুর গ্রামে। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে।

যতীন্দ্রনাথের লেখা উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল - 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'সায়ম', 'ত্রিযামা', 'কাব্য পরিমিতি', 'নিশান্তিকা' 'প্রভৃতি'। কবি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ৬৭ বছর বয়সে লোকান্তরিত হন।

কবিতার মূলকথা

নবান্নের দিনে দুর্ভাগ্যকবলিত এক চাষির বাড়িতে তার বন্ধু এসেছে। ভাগ্যহত চাষিটি তার দু:খের বর্ণনা দিচ্ছে বন্ধুর কাছে। গত রাতে তার পাকা ধানের খেতে মই পড়ে বিপর্যয় ঘটে গেছে। অথচ আজ নতুন চালের উৎসব নবান্ন। বৈশাখ থেকে আশ্বিন, কঠোর মেহনত করতে হয় চাষিকে।

দু:খের কথা শুনে বন্ধুকে হাই তুলতে দেখে চাষি ধানের গল্প থেকে সরে আসে। চাষি চিরদিন অন্নহীন। তবু নবান্ন উৎসবের দিনে অন্নপিন্ড, দু'বন্ধুতে ভাগাভাগি করে গ্রহণ করবে। চরম প্রণামের সময় বন্ধু যেন অশিষরূপে তার মস্তকে হানে চরম আঘাত। দু:খবাদী কবির দু:খের এ এক বিচিত্র কল্পনা।

এসেছ বন্ধু ? তোমার কথাই জাগছিল ভাই প্রাণে,
কাল রাতে মোর মই পড়ে গেছে খেতভরা পাকা ধানে।
ধান্যের ঘ্রাণে ভরা অঘ্রানে শুভ নবান্ন আজ,
পাড়ায় পাড়ায় উঠে উৎসব, বন্ধ মাঠের কাজ।
লেপিয়া আঙিনা দেয় আলপনা ভরা মরাই-এর পাশে,
লক্ষ্মী বোধ হয় বানিজ্য ত্যজি' এবার নিবসে চাষে।
এমন বছরে রাতারাতি মোর পাকা ধানে পড়ে মই !
দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসো- সে দু:খের কথা কই।

বোশেখ, জ্যষ্টি, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্দর, আশ্বিন, -
আশা-আতঙ্কে খেয়াল ছিল না কোথা দিয়ে কাটে দিন।
দুর্যোগে সবে বালির বাঁধনে বাঁধিনু বন্যাধারা,
বুকের রক্ত জল করে কভু সেচিনু পাণ্ডুচারা।
কার্তিকে দেখি চারিদিকে - একি ! এবার তো নহে ফাঁকি !
পাঁচরঙা ধানে ছককাটা মাঠ জুড়ায় চাষার আঁখি।
অঘ্রানে থাকে থাকে

কাটিয়া তোলায় খামারে গোলায় যাহার যেমন পাকে।
আমি রোজ ভাবি ফসলটা নাবি, আরও কটা দিন যাক,
ভরা অঘ্রাণে ঘটে না তো কোনো দৈব দুর্বিপাক।
মরাই-সারাই শেষ করে, সবে খামারে দিইছি হাত,
কালকে হঠাৎ-

বন্ধু, দোহাই তুলো নাকো হাই, হইনু অপ্রগলভ-
ক্ষমা করো সখা, বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প।
তার চেয়ে এসো প্রভাত আলোকে চেয়ে থাকি দূরে-দূরে-,
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জরির ডুরে।
যেথায় আকাশে ভুলে নেমে আসে মানস-মরালশ্রেনি,
যেথা দিক্‌বালা শীতের বেলায় এলায় আঁচল বেণী।

উঠো না বন্ধু, অঘ্রাণ মাস, তাহে নবান্ন ভাই।
আজিকার দিনে চাষার ঘরে যে কুটুম ফিরাতে নাই।
বারবেলাটুকু কাটুক দেবতা, ঘুরে আসি খেত খানা,
মইডলা ভুঁই ঘেঁটে খুঁটে আনি যা পাই ধানের দানা!
চিরান্নহীন নবান্নদিনে এসেছ আমার ঘরে,
শুভক্ষণে শেষ অন্নপিণ্ড অর্পি পরস্পরে,
চরম প্রণাম করিব যখন, বন্ধু মাথায় কিরে-
ফণায়িত করে আশিষ ঢালিয়া দংশিও মোর শিরে !

শব্দার্থ

মই = সিঁড়ি
ঘ্রাণ = গন্ধ
দাওয়া = বারান্দা
তুচ্ছ = নগণ্য
কাঁকালে = কোমরে
ফাঁকি = ছলনা
ফাঁকি = বঞ্চিত
কুটুম = আত্মীয়
নবান্ন = নতুন অন্ন
গোলা = শস্যাগার
দুর্বিপাক = দুর্যোগ
মরাল = হাঁস
পান্ডু = ফ্যাকাশে
শিরে = মাথায়
অপ্রগলভ = নিজেরগুণ বা মর্যাদা কিছু মাত্র জাহির করে না এমন

অনুশীলনী

১. আকলন

নির্দেশ অনুযায়ী কৃতিকার্য সম্পাদন করো :-

অ) ছক পূর্ণ করো :-

(১)

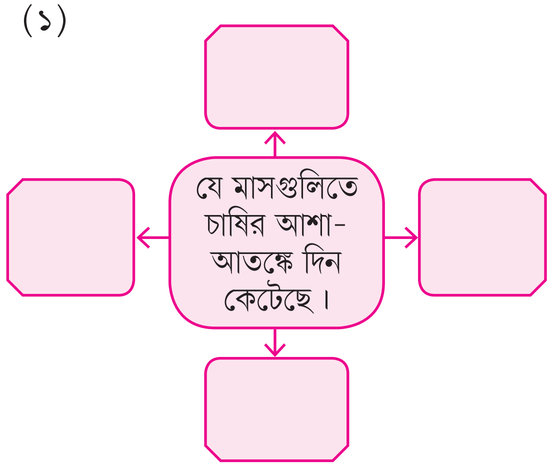

(২)

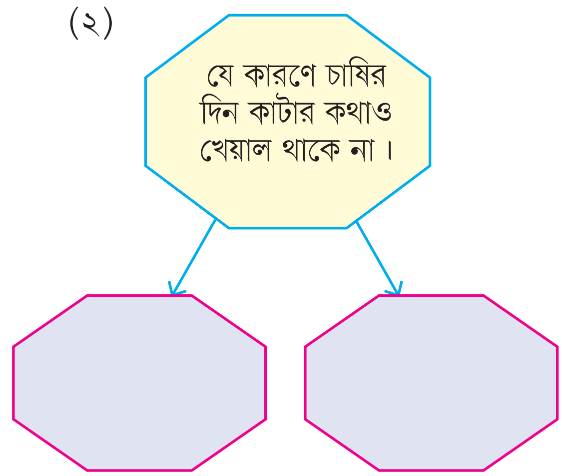

আ) কারণ লেখ :-

(১) আজ মাঠের কাজ বন্ধ...

(২) বন্ধুর কাছে চাষি ক্ষমা চেয়েছিল...

(৩) চাষি লোকটির বন্ধুর কথা মনে জেগেছিল...

২. শব্দ সম্পদ

অ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখ :-

বন্ধু, পাকা, আজ, লক্ষ্মী, শেষ, শীত, দূরে, শুভ

আ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমার্থক শব্দ লেখ :-

ঠেঁস, তুচ্ছ, এলায়, গাঙ, কুটুম

৩. কাব্যসৌন্দর্য

অ) 'লক্ষ্মী এবার বানিজ্যের বাস ছেড়ে হয়তো চাষে বাস করলেন' - তাহা যে পঙক্তিগুলির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে সে পঙক্তিগুলির অর্থ লেখ ।

আ) যোগ্য উত্তরটি বেছে নাও :-

আজ কোন্ উৎসব ?

১) নববর্ষ উৎসব ২) নবান্ন উৎসব ৩) পঞ্চমী উৎসব

৪. অভিব্যক্তি

অ) 'চাষিরাই দেশের অন্নদাতা' - এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়া মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত- এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৫. রসাস্বাদন

অ) নবান্ন কবিতা অবলম্বনে নবান্ন উৎসবের বর্ণনা দাও।

আ) 'আশা-আতঙ্কে খেয়াল ছিল না কোথা দিয়ে কাটে দিন।'-এ কথা গুলির মাধ্যমে চাষির মনোভাব ব্যক্ত করো।

ই) নবান্ন কবিতার - ভাগ্যহত চাষির জীবনে যে ভাবে দু:খ নেমে এসেছিল তাহা আলোকপাত করো।

ঈ) 'লক্ষ্মী বোধ হয় বানিজ্য ত্যজি এবার নিবসে চাষে'- উদ্ধৃত চরণটির তাৎপর্য লেখ ।

৬. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) দরিদ্র চাষিটির বন্ধুর কথা মনে জেগেছিল কেন?

আ) চাষি তার বন্ধুর কাছে ক্ষমা চেয়েছে কেন ?

ই) কোন দৃশ্য দেখে চাষির চোখ জুড়িয়ে যায় ?

ঈ) 'কালকে হঠাৎ' বলতে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছিল?

৭. সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

অ) কবির কার কথা প্রাণে জাগছিল?

আ) কার পাকাধানে মই পড়েছে ?

ই) কি রকম বছরে চাষির পাকা ধানে মই পড়েছে?

ঈ) কোন দিনে কুটুম ফিরাতে নেই ?

উ) কোন মাসে নবান্ন উৎসব হয়?

ঊ) চাষিটি কার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন?

৮. ভারতবর্ষ

- সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

লেখক পরিচিতি

জন্ম ১৪ই অক্টোবর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাস পুরে। তিনি এমন একটি পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন যেখানে শিক্ষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সুন্দর পরিবেশ ছিল। ১৯৪৬- এ বর্ধমান জেলার গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্নাতক হন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে। পাঠ্যবিষয়ের বাইরে বই পড়ার আগ্রহ বাল্যবয়সেই ছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের 'ভান্ডার' পত্রিকায় কাজ করেন ১৯৬৪-১৯৬৯। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নীল ঘরের নটী' প্রকাশিত হয়, ১৯৬৬ সালে। সামগ্রিক সাহিত্য কর্মের জন্য তিনি একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। কথা সাহিত্যের সঙ্গে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। 'হিজল কন্যা', 'নিশিমৃগয়া', 'মায়া মৃদঙ্গ', 'স্রোতে ভেসে আছি', ইত্যাদি তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ছোটোদের জন্য লিখেছেন গোয়েন্দা কর্নেল সিরিজের বহু বই।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রয়াত হন ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দে।

পাঠের মূলকথা

কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ আর তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী ধর্ম - এই নিয়েই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'ভারতবর্ষ'। সমাজে ধর্মের উদ্ভবের পিছনে হয়তো ছিল মানুষের মঙ্গল সাধনের আকাঙ্ক্ষা। পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু মানুষ এসেছেন। তাঁরা ভালোবাসার বাণী শুনিয়েছেন, মানুষে-মানুষে মিলনের কথা, বিশ্বাসের কথা বলেছেন। কিন্তু সবই যে প্রায় ভস্মে ঘি ঢালার মতো তা বোঝা যায় এ গল্পটিতে, যা সমাজেরই মধ্য দিয়েই লেখক গল্পের জনতাকে এবং পাঠকদের এই চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছেন যে, এদেশ হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, এদেশ আপামর ভারতবাসীর।

পিচের সড়ক বাঁক নিয়েছে যেখানে, সেখানেই গড়ে উঠেছে একটা ছোট্ট বাজার। পিছনে গ্রাম, ঘন বাঁশবনে ঢাকা। গ্রামে বিদ্যুত নেই, তাই মাঝে-মাঝে বিমর্ষ সভ্যতার মুখ চোখে পড়ে - যখন কিনা কাঁচা রাস্তা ধরে সবুজ ঝোপের ফাঁকে এগিয়ে আসে কোনো যুবক বা যুবতী, পরনে যা পোশাক, তা আমেদাবাদের কারখানায় তৈরি। কিন্তু বাজারে বিদ্যুৎ আছে। তিনটে চায়ের দোকান, দুটো সন্দেশের, তিনটে পোশাকের, একটা মনোহারির, দুটো মুদিখানার। আর একটা আড়ত আছে। একটা হাস্কিং মেসিন আছে। তার পিছনে ইটভাটা আছে। চারপাশের গ্রাম থেকে লোকেরা আসে। রাত নটা অব্দি জোর জমাটি- ভাব থাকে। তারপর সব ফাঁকা। শুধু কিছু আলো জ্বলে। কিছু নেড়ি কুত্তার ছায়া ঘোরে পিচের ওপর। মাঝে - মাঝে চলে যায় ট্রাক দূরের শহরের দিকে। আবার সব চুপচাপ। বাঁকের মুখে আদ্যিকালের বটগাছে পেঁচার ডাকও স্তব্ধতার অন্তর্গত মনে হয়।

সময়টা ছিল শীতের। বাজারের উত্তরে বিশাল

মাঠ থেকে কনকনে বাতাস বয়ে আসছিল সারাক্ষণ। তারপর আকাশ ধূসর হল মেঘে। হালকা বৃষ্টি হল। রাঢ়বাংলার শীত এমনিতেই খুব জাঁকালো । বৃষ্টিতে তা হল ধারালো। ভদ্রলোকে বলে, 'পউষে বাদলা'। ছোটোলোকে বলে 'ডাওর'। আর বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস জোরালো হলে তারা বলে 'ফাঁপি'। সেবার এই আবহাওয়া হয়ে পড়ল 'ফাঁপি'। তখনও দূরের মাঠে ধান কাটা হয়নি । এই অকাল-দুর্যোগে ধানের ক্ষতি হবে প্রচন্ড। তাই লোকের মেজাজ গেল বিগড়ে। চাষাভুষো মানুষ চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে-দিতে প্রতীক্ষা করতে থাকল রোদে ঝলমল একটা দিন এবং মুন্ডুপাত করতে থাকল আল্লা- ভগবানের । শেষ অব্দি ক্ষিপ্ত কোনো- কোনো যুবক চাষি চেঁচিয়ে - ব'লে দিল- মাথার ওপর আর কোনো শালা নেই রে - কেউ নাই।

কেউ নেই মাথার ওপর, তখন যা খুশি করা যায়। ক্ষিপ্ত মেজাজে কথায় কথায় তর্ক বাধে। মারামারির উপক্রম হয়। এবং তর্কের কোনো প্রসঙ্গ নেই- একটা কিছু পেলেই হল। সেই দুরন্ত শীতের অকাল-দুর্যোগে গ্রামের ঘরে বসে কারো সময় কাটেনা। সবাই চলে আসে সভ্যতার ছোট্ট উনোনের পাশে হাত-পা সেঁকে নিতে। এই টুকুই যা সুখ তখন। এবং অলস দিন কাটানোর এক ঘেয়েমি দূর করতেই নানান কথা আসে। বোমবা-ইয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী কিংবা গায়ক, অথবা ইন্দিরা গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী, এম.এল.এ.- নয়তো সরা বাউরি সে - সবই এসে পড়ে। জোর কথা কাটাকাটি হয় চাওলার বিক্রিবাটা বাড়ে। ধানের মরশুম-আজ না - হোক, কাল পয়সা পাবেই, তাই ধারের অঙ্ক বেড়ে চলে।

সেই সময় এল এক বুড়ি। থুত্থুড়ে কুঁজো ভিখিরি বুড়ি। রাক্ষুসী চেহারা। একমাথা শাদা চুল। ছেঁড়া নোংরা একটা কাপড় পরনে, গায়ে জড়ানো তেমনি চিটচিটে তুলোর কম্বল, এক হাতে বেঁটে লাঠি। পিচের পথে ভিজতে-ভিজতে দিব্যি একই তালে হেঁটে এল। ক্ষয়া খর্বুটে মুখে তার সুদীর্ঘ আয়ুর চিহ্ন প্রকট। তাকে দেখে সবাই তর্ক থামালো । এই দুর্যোগে কীভাবে বেঁচেবর্তে হেঁটে আসতে পারল, সেটাই সবাইকে অবাক করেছিল।

চা খুব আরামে গিলে বুড়ি সবার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না। তখন একজন তাকে জিজ্ঞেস করল- ও বুড়ি, তুমি এলে কোত্থেকে?

বুড়ি মেজাজি । গজগজ করে জবাব দিল- সে - কথায় তোমাদের কাজ কী বাছারা ?

ওরা হেসে উঠল- । ওরে বাবা ! ভারি তেজি দেখছি ! এই বাদলায় তেজি টাট্টুর মতন বেরিয়ে পড়েছে।

বুড়ি খেপে গেল।- তোমাদের কত্তাবাবা টাট্টু ! খবর্দার, অকথাকুকথা বোলোনা। আমি যেখান থেকেই আসি, লোকের কি ?

একজনে ঠান্ডা মাথায় বলল- ও বুড়ি, তুমি থাকো কোথায়, তাই জিজ্ঞেস করছে এরা। -তোমাদের মাথায়।

বলেই সে কম্বলের ভেতর থেকে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা পয়সা খুলতে থাকল। তারপর চায়ের দাম মিটিয়ে আবার রাস্তায় নামল।

লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল- মরবে রে, নির্ঘাত মরবে বুড়িটা!

বুড়ি ঘুরে বলল- তোরা মর্, তোদের শতগুষ্টি মরুক।

সবাই দেখল বুড়ি নড়বড় করে বাঁকের মুখের বটতলায় গেল। বটতলাটা ফাঁকা। মাটি ভিজে প্রায় কাদা হয়ে রয়েছে। সে সবার অবাক চোখের সামনে সেখানে গিয়ে গুঁড়ির কাছে একটা মোটা শেকড়ে বসে পড়ল। শেকড়টার পিছনে গুঁড়ির গায়ে খোঁদল আছে। সেখানে পিঠ ঠেকিয়ে পা ছড়াল সে। বোঝা গেল, বুড়ির অভিজ্ঞতা প্রচুর আছে। অর্থাৎ সে বৃক্ষবাসিনী।

কেউ কেউ বলল- বরং বারোয়ারিতলায় গেলেই

পারত। নির্ঘাত মরে যাবে। এ-কথার পর স্বভাবত এবার বুড়িকে নিয়ে অনেক কথা এসে পড়ল। আবার জমে গেল।...

***

পউষে বাদলা সম্পর্কে গ্রামের 'ডাকপুরুষের' পুরোনো 'বচন' আছে। তা হল : শনিতে সাত, মঙ্গলে পাঁচ, বুধে তিন - বাকি সব দিন-দিন। অর্থাৎ শনিতে বাদলা লাগলে সাতদিন থাকবে, মঙ্গলে পাঁচদিন, বুধে তিনদিন। অন্যদিনে লাগলে একদিনের ব্যাপার। এ বাদলা লেগেছিল মঙ্গলে। কেউ অবশ্য হিসেব করেনি- কিন্তু যেদিন ছাড়ল, সেদিন, আকাশ পরিস্কার হয়ে গেল একেবারে। সূর্যের উজ্জ্বল মুখ দেখা গেল। আর, সবাই আবিষ্কার করল বটতলায় সেই গুঁড়ির খোঁদলে পিঠ রেখে বুড়ি চিত হয়ে পড়ে আছে- নি:সাড়।

অনেকটা বেলা হলেও সে নড়ছে না দেখে চাওলা জগা বলল- নির্ঘাত মরে গেছে বুড়িটা। একজন বলল - সর্বনাশ ! তাহলে শ্যাল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে যে ! গন্ধে টেঁকা যাবে !

একজন দুজন করে ভিড় বাড়তে থাকল। কেউ কেউ বুড়ির কপাল ছুঁয়ে দেখল- প্রচন্ড ঠান্ডা। একজন নাড়িও দেখল- কোনো স্পন্দন নেই। অতএব মড়াই বটে।

চৌকিদারকে খবর দেওয়া হল। সে এসে বলল- থানায় খবর দিয়ে কী হবে ? ফাঁপিতে এক ভিখিরি পটল তুলেছে, তার আবার থানা-পুলিশ! পাঁচ কোশ দূরে থানায় খবর দাও, তারপর ওনার আসতে আসতে রাত- দুপুর। ততক্ষণে গন্ধ ছুটবে। কবে মরেছে হিসেব আছে নাকি? দেখছ না, ফুলে ঢোল হয়েছে কেমন।

- তাহলে কী'করব চৌকিদারদা ?

- লদীতে ফেলে দিয়ে এসো ! ঠিক গতি হয়ে যাবে- যা হবার !

বিজ্ঞ চৌকিদারের পরামর্শ মানা হল। মাঠ পেরিয়ে দু-মাইল দূরে নদী। এখন শুকনো। সেখানে চড়ায় ফেলে দিয়ে এল ক'জন মিলে। বাঁশের চ্যাং দোলায় ঝোলানো হয়েছিল। সেটাও ফেলে দিয়ে এল ওরা। বুড়ির শরীর উজ্জ্বল রোদে তপ্ত বালিতে চিত হয়ে পড়ে রইল।

ফিরে এসে সবাই দিগন্তে চোখ রাখল ঝাঁকে ঝাঁকে কখন শকুন নামবে।

***

হঠাৎ বিকেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। মাঠ পেরিয়ে একটা চ্যাংদোলা আসছে। সেটা যখন বাজারে পৌঁছোল তখন জানা গেল ব্যাপারটা। সেই বুড়ির মড়াটাই তুলে নিয়ে আসছে মুসলমান-পাড়ার লোকেরা। আরবি মন্ত্র পড়ছে ওরা। মাথায় টুপিও পরেছে কেউ কেউ।

যারা ফেলে দিয়ে এসেছিল, তারা হিন্দু। তারা অবাক হয়ে এবং রেগে গিয়ে জানতে চাইল- কী ব্যাপার ?

না- বুড়ি যে মুসলমান।

প্রমাণ ?

প্রমাণ অনেক। অনেকে তাকে শুনেছে বিড়বিড় করে আল্লা বা বিসমিল্লা বলতে। এমন কী গাঁয়ের মোল্লা- সায়েব অকাট্য শপথ করে বললেন- আজ ফজরে (ভোরের নমাজের সময়) যখন নমাজ সেরে এদিকে বাস ধরতে আসছি, তখনই বুড়ি মারা যাচ্ছিল। ওকে স্পষ্ট কলমা পড়তে শুনলাম। তা- কে জানে, বুড়ি মরছে ? আমি যাচ্ছি শহরে- মামলার দিন। তাই দেখা হল না ব্যাপারটা।

ফিরে এসে শুনি ওকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তৌবা ! তৌবা ! তা কি হয় আমরা বেঁচে থাকতে ? তাই কবরে দেবার ব্যবস্থা করলাম।

গাঁয়ের ভটচাজমশাই সবে বাস থেকে নেমেছেন। উঁকি মেরে সব দেখে-শুনে বললেন - অসম্ভব। আমিও তো মোল্লার সঙ্গে একই বাসে আজ শহরে

গিয়েছিলুম। আমি স্পষ্ট শুনেছি, বুড়ি বলছিল শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি।

তাঁর সপক্ষে অনেক প্রমাণ জুটে গেল। নকড়ি নাপিত দিব্যি ক'রে বলল- কাল আমি কামাতে বসব বলে বটতলায় এসেছিলাম। দেখলাম বসা যাবে না। তখন বুড়িকে স্পষ্ট বলতে শুনেছি আপন মনে বলছে- হরিবোল, হরিবোল !

- ভুল শুনেছ ! ফজলু সেখ বলল ! আমি স্বকর্ণে শুনেছি, বুড়ি লাইলাহ ইল্লাল্ল বলছে। নিবারণ বাগদি রাগী লোক । একসময় দাগি ডাকাত ছিল। চেঁচিয়ে উঠল- মিথ্যে !

করিম ফরাজি এখন খুব নমাজ পড়ে এবং 'বান্দা' মানুষ। একদা সে ছিল পেশাদার লাঠিয়াল।

নিবারণের চ্যাঁচানি বরদাস্ত করবে কেন সে ?

আরো চেঁচিয়ে বলল- খবরদার !

বচসা বেড়ে গেল। তর্কাতর্কি উত্তেজনা হল্লা চলতে থাকল। তারপর দেখা গেল একদল লোক সেই বাঁশের চ্যাংদোলাটা নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে। দেখতে-দেখতে প্রচন্ড উত্তেজনা ছড়াল চারদিকে। দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হতে থাকল। আর তার পরই দেখা গেল গ্রাম থেকে অনেক লোক দৌড়ে আসছে। সবার হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।

চ্যাংদোলাটা তখন পিচের ওপর। বুড়ির মড়ার দু-পাশে স্পষ্ট দুটো জনতা দাঁড়িয়ে গেছে। দু-দলের হাতেই অস্ত্রশস্ত্র। পরস্পরকে লক্ষ করে গালাগালি চলছে। মাঝে-মাঝে মোল্লাসাহেব চেঁচিয়ে উঠছেন- মোছলেম ভাইসকল! জেহাদ, জেহাদ!

নারায়ে তকবির - আল্লাহু আকবর !

অন্যদিকে ভটচাজমশাই গর্জে বলছেন- জয় মা কালী ! যবন নিধনে অবতীর্ণ- হও মা! জয় মা কালী কি জয় !

ধুন্ধুমার গর্জন প্রতিগর্জন এবং দেখা গেল, বিপন্ন আইন রক্ষক বেচারা নীল উর্দিপরা চৌকিদার তার লাঠিটি উঁচিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং দু-পক্ষকেই কিছু বলার চেষ্টা করছে। যখনই মুসলিমপক্ষ এক-পা এগিয়ে আসে সে মরিয়া হয়ে লাঠিটা পিচে ঠুকে গর্জায়-সাবধান ! আবার হিন্দুপক্ষ এগোলে সে একই ভাবে সেদিকে লাঠি ঠুকে চেঁচায়- খবরদার !

কতক্ষণ সে এই মারমুখী জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত কে জানে - সে এবার পর্যায়ক্রমে

পাগলের মতন একবার ক'রে পিচে লাঠি ঠুকতে শুরু করল। খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দে কাঁপতে থাকল।

তারপরই দেখা গেল অদ্ভুত দৃশ্য। বুড়ির মড়াটা নড়ছে। নড়তে - নড়তে উঠে বসার চেষ্টা করছে। দু-দিকের সশস্ত্র জনতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। চৌকিদার হাঁ করে দেখছে।

তারপর বুড়ি উঠল। উঠে দু-দিকে তাকাল-ভিড় দুটোকে দেখল। মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। সেই বিকৃত মুখে ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে উঠল সে।

চৌকিদার এতক্ষণে মুখ খুলে বলল- বুড়িমা ! তুমি মরনি !

- মর্, তুই মর্। তোর শতগুষ্টি মরুক!

দু-দিকের ভিড়ও চেঁচিয়ে উঠল-বুড়ি ! তুমি মরনি !

- তোরা মর্ । তোরা মর্ মুখপোড়ারা !

- বুড়ি, তুমি হিন্দু না মুসলমান ?

বুড়ি খেপে গিয়ে বলল- চোখের মাথা খেয়েছিস মিনষেরা? দেখতে পাচ্ছিস নে ? ওরে নরক খেকোরা, ওরে শকুন চোখোরা ! আমি কী তা দেখতে পাচ্ছিস নে ? চোখ গেলে দোব-যা, যা পালা:।

ব'লে সে নড়বড় করে রাস্তা ধরে চলতে থাকল। ভিড় সরে তাকে পথ দিল। শেষ রোদের আলোয় সে দূরের দিকে ক্রমশ আবছা হয়ে গেল।

শব্দার্থ

পিচ = আলকাতরা	**খেপে** = রেগে	**সড়ক** = রাস্তা
ক্ষিপ্ত = ক্রুদ্ধ	**আড়ত** = গোলা, গুদাম	**মুন্ডুপাত** = শিরচ্ছেদ
মরশুম = ঋতু	**খর্বুটে** = খাঁটো	**খোদল** = গর্ত
বান্দা = অনুগত	**চড়ায়** = চরে	**দাগি** = কলঙ্কিত
গর্জন = চিৎকার	**বচসা** = বাগ্‌যুদ্ধ	

অনুশীলনী

১. আকলন

নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করো :-

অ) ছক পূর্ণ করো :-

(১)

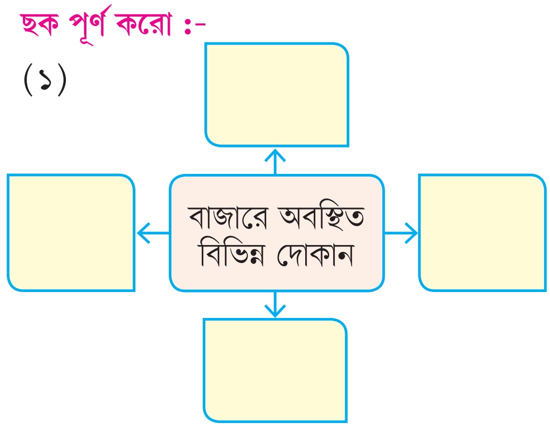

(২)

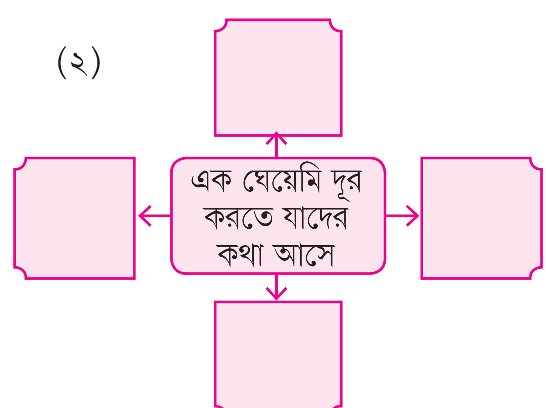

(৩)

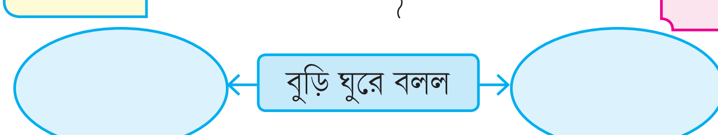

আ) কারণ লেখ :-

(১) চাষাভুষো মানুষ চায়ের দোকানে বসে আল্লা- ভগবানের মুন্ডুপাত করতে থাকে...

(২) চৌকিদারকে খবর দেওয়া হল...

(৩) হঠাৎ বিকেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল...

২. শব্দ সম্পদ

অ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :-

গ্রাম, সাড়, সুযোগ, মূর্খ, বিপক্ষে, বহির্গত, অল্প

আ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমানার্থক শব্দ লেখ :-

অঙ্ক, দুরন্ত, ধার, ঠান্ডা, শপথ, কবর, আবছা

ই) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো :-

দুর্যোগ, দিগন্ত, পরস্পর, ইত্যাদি, জনৈক, বিবেকানন্দ

ঈ) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখ :-

আল্লা ভগবান, শ্যাল কুকুর, সপ্তকান্ড, আইনরক্ষক, শতগুষ্টি, অকথাকুকথা, অস্ত্রশস্ত্র, ভালোমন্দ

৩. অভিব্যক্তি

অ) 'জাতিভেদ' একটি সামাজিক কলঙ্ক - এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) 'ভারতবর্ষ' - একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র'- এই বিষয়ে তোমার অভিমত স্পষ্ট করো।

৪. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) 'মুন্ডুপাত করতে থাকে আল্লা - ভগবানের' - কারা কেন আল্লা ভগবানের মুন্ডুপাত করতে থাকে ?

আ) কোথায় কীভাবে ধারের অঙ্ক বেড়ে যায় তাহা লেখ।

ই) পৌষে বাদলা নিয়ে গ্রামের ডাক পুরুষের'- বচন সম্পর্কে আলোকপাত করো।

ঈ) ভারতবর্ষ গল্পে লেখকের সমাজ সচেতনতার কী পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করো।

উ) কোন ঘটনার জন্য চৌকিদারকে খবর দেওয়া হয়েছিল ?

ঊ) "হঠাৎ বিকেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল"-বিকেলে হঠাৎ কোন দৃশ্য দেখা গেল তাহা লেখ।

৫. সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

অ) বাজারে কী কী দোকান আছে ?

আ) কোথাকার শীত খুব জাঁকালো ?

ই) রাঢ় বাংলায় শীত কালে বৃষ্টি হলে ছোটলোকেরা তাকে কী বলে ?

ই) লোকের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল কেন ?

উ) চায়ের দোকানে আসা বুড়িটির চেহারা কেমন ছিল ?

৯. শিকার

- জীবনানন্দ দাশ

কবি পরিচিতি

জীবনানন্দ দাশের জন্ম ১৭ ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ বরিশাল জেলা শহরে। বাবা সত্যানন্দ দাশ। মা কুসুম কুমারী দেবী। 'আমাদের দেশে হবে, সেই ছেলে কবে কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে'- বহু বিশ্রুত 'আদর্শ ছেলে' কবিতার রচয়িত্রী। জীবনানন্দ দাশ ৯ বছর বয়সে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেনীতে ভরতি হন। ১৯১৫- য় ম্যাট্রিক পাশ। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজী অনার্স-সহ বি.এ. পাশ। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ.পাশ করেন।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশ জীবৎকালে সমাদর পাননি। উপেক্ষিত হয়েছেন। প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। তবু তিনি অবিরাম লিখে গিয়েছেন। সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে 'ঝরাপালক', 'ধূসর পান্ডুলিপি', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। গল্প উপন্যাসও লিখেছেন বিস্তর। যেমন 'নিরুপম যাত্রা' 'জল পাইহাটি', 'প্রেতিনীর রূপকথা' ইত্যাদি। প্রয়াত হন ১৯৫৪ য় পথ দুর্ঘটনায়।

কবিতার মূলকথা

জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'শিকার' কবিতায় ভোরের সূর্যের প্রথম আলোয় উদ্ভাসিত প্রকৃতির বুকে একটি 'সুন্দর বাদামি হরিণ' - এর নৃশংস হত্যার ছবি এঁকেছেন। এই বর্ণনার- আগে হরিণটির বন্য জীবনের স্নিগ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন কবি। সারারাত হরিণটি নিজেকে চিতাবাঘিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছিল আর অপেক্ষা করেছিল ভোরের জন্য। সূর্য উঠলে ভোরের আলোয় বেরিয়ে আসে হরিণটি তারপর শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্য গা ভাসায় নদীর শীতল জলে। অথচ এই সব আকাঙ্ক্ষারই অবসান হয়ে যায় শুধু একটি গুলির শব্দে। মানুষের পাশবিক ক্ষুধার কাছে বলি হতে হয় প্রকৃতির নিরপরাধ জীব হরিণটিকে।

ভোর,
আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল :
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।
একটি তারা এখন আকাশে রয়েছে:
পাড়াগাঁর বাসর ঘরে সবচেয়ে গোধূলিমদির মেয়েটির মতো,
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা আমার নীল মদের
গেলাসে রেখেছিল।
হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি-

তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বেলেছে-এখনও
হিমের রাতে শরীর 'উম' রাখবার জন্য দেশোয়ালিরা সারারাত মাঠে আগুন
জ্বেলেছে মোরগফুলের মতো লাল আগুন,
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের,
সূর্যের আলোয় তার রং কুসুমের মতো নেই আর,
হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো। সকালের আলোয়
টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ ময়ূরের
সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।
ভোর,
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নক্ষত্রহীন,
মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে।
সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল !
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;
কচি বাতাবিলেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল-
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো
একটা আবেশ দেওয়ার জন্য,
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো একটা বিস্তীর্ণ
উল্লাস পাবার জন্য,
এই নীল আকাশের নীচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে সাহসে
সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর
পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।
একটা অদ্ভুত শব্দ।

নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বলল আবার- উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এল।
নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় বসে
অনেক পুরানো শিশির ভেজা গল্প,
সিগারেটের ধোঁয়া, টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা,
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক হিম-নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

শব্দার্থ

কোমল = নরম	**বিবর্ণ** = ফ্যাকাশে	**হিম** = ঠান্ডা	**উম্** = উত্তাপ
বিস্তীর্ণ = ব্যাপ্ত	**নিস্পন্দ** = নড়াচড়াহীন	**উষ্ণ** = গরম	**জরায়ু** = গর্ভাশয়
গোধূলি = সূর্যাস্তের সময়	**মেহগনি** = মূল্যবান কাঠ বিশেষ বা তার গাছ		**মানুষী** = মানবী

অনুশীলনী

১. আকলন

নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করো :-

অ) ছক পূর্ণ করো :-

(১)

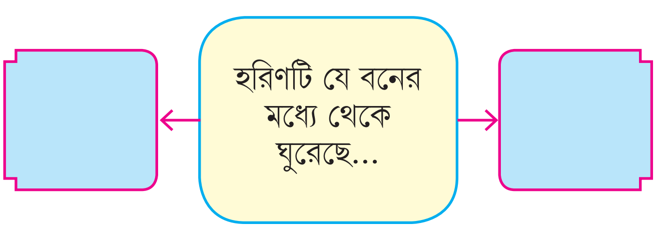

(২)

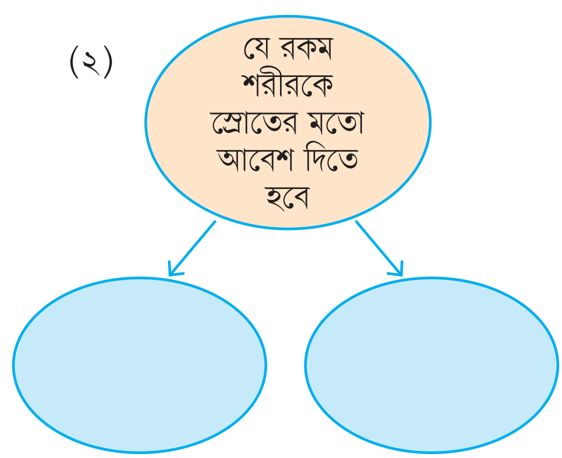

আ) কারণ লেখ :-

(১) দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে...

(২) হরিনটি নদীর শীতল ঢেউয়ে নামল...

(৩) নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল হয়ে উঠল...

২. শব্দ সম্পদ

অ) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখ :-**

রাত, গরম, সকাল, বন, অন্ধকার, নীচে, পুরানো

আ) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমার্থক শব্দ লেখ :-**

দেহ, হাজার, হাত, শীতল, আকাশ

৩. কাব্যসৌন্দর্য

অ) **'নাগরিক জীবনের কাছে প্রকৃতির পরাজয়ের প্রতীক হয়ে থাকে হরিণের মৃত্যু- তাহা যে পঙক্তিগুলির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে সে পঙক্তিগুলির অর্থ লেখ।**

আ) **যোগ্য উত্তরটি বেছে নাও।**

হরিণটি কোথায় নেমে এসেছে ?

১) রাতের গভীর অন্ধকারে। ২) ভোরের আলোয়। ৩) মধ্য রাত্রে।

৪. অভিব্যক্তি

অ) 'প্রতিটি মানুষই প্রকৃতিপ্রেমী হওয়া উচিত' - এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) 'বন্য প্রাণীদের সুরক্ষার জন্য অধিক সংখ্যায় অভয়ারণ্য নির্মিত হওয়া উচিত' - এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৫. রসাস্বাদন

অ) 'শিকার' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ ভোরের প্রকৃতি ও জীবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাহা লেখ।

আ) 'সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।' হরিণের ভোরের জন্য অপেক্ষার কারণ কী ? এই ভোরে তার ক্রিয়াকলাপ কী ছিল ?

ই) 'ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেশ দেওয়ার জন্য'- কার সম্পর্কে এ কথা ? উদ্দিষ্ট জীবের শারীরিক অবস্থা এমন কেন ?

৬. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) শিকার কবিতায় হরিণের উপস্থিতি কতটা গুরুত্বপূর্ন ?

আ) শিকার কবিতার মূল ভাব ব্যক্ত করো।

ই) 'শিকার কবিতা উপমা- সর্বস্ব'- আলোচনা করো।

৭. সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

অ) হরিণটিকে আক্রমণ করেছিল কে ?

আ) ভোরের আলোয় নেমে এসেছে কে ?

ই) শিকার কবিতায় কোন ঋতুর কথা উল্লেখ আছে ?

ঈ) শিকার কবিতায় হরিণের কাঙ্খিত উল্লাসটি কেমন ?

উ) নদীর জল কোন ফুলের পাপড়ির মতো লাল ?

ঊ) কিসের মাংস তৈরি হয়ে এসেছিল ?

কাব্যরস

কাব্যরসের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। রসকে কাব্যের প্রাণ মানা হয়। রসের মাধ্যমেই কাব্যে ভাব নির্মিত হয়। নীচে কয়েকটি রসের নাম ও উদাহরণ দেওয়া হলো :

১) **ভয়ানক রস :**

‘এই পথ ধেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে
‘হায় হায়’ রব তুলেছে বাঁশের বনে
কলাবাগানে করেছে দু:শাসনের দৌরাত্ম্য।’

২) **বীভৎসরস :**

‘গলিটার কোনে কোনে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি কাঁঠালের ভুতি
মাছের কানকো
মরা বেড়ালের ছানা
ছাই পাশ আরো কত কী যে।’

৩) **রৌদ্ররস :**

‘কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি,
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?’

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪) **শান্তরস :**

‘কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এ যায় আর আসে, জগতের রীতি
সাগর তরঙ্গ যথা’

৬) **বাৎসল্য রস :**

উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান
নাহি খায় ক্ষীরননী সরে।
অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।।

১০. ইস্পাতের মেয়ে

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য সম্রাট । তিনি ২৬ শে জুন ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর। অসাধারণ মেধা ও প্রতিভাশক্তির অধিকারী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র বি.ত্র.পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক হন।

শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার আগেই বঙ্কিম-চন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয় মাত্র কুড়ি বছর বয়সে। সরকার তাকে ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' - এ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের সূচনা।

তার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন পথের দিশারি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা চৌদ্দো। 'কপালকুন্ডলা', 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'ইন্দিরা', 'রজনী', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখ যোগ্য উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন দেশপ্রেমিক ও স্বজাতিবৎসল। তিনি দেশাত্মবোধক গান 'বন্দে মাতরম- এর রচয়িতা।' এই লোকবরেণ্য মনীষীর মহাপ্রয়াণ ঘটে ৮ ই এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে।

পাঠের মূলকথা

'ইস্পাতের মেয়ে' কাহিনীর প্রধানা নারীচরিত্র প্রফুল্ল। প্রফুল্লের সঙ্গে কথা বলে ও নানা প্রশ্ন করে ভবানী পাঠক বুঝেছেন প্রফুল্লের মধ্যে ইস্পাততুল্য বহু উপাদান তথা গুন আছে। সেজন্য প্রফুল্লকে ইস্পাত মনে হয়েছে ভবানী পাঠকের । প্রফুল্লের চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তার সাহসিকতা, সত্য, স্পষ্টবাদিতা ও পাপাচারে অবিশ্বাসী। বাঙালী নারী হয়ে প্রফুল্ল একটি দুর্লভ চরিত্র।

১.

প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের ভিতর এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিল। পথে বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। দেখিল এক জায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে। যখন পথের রেখা এদিকে গিয়াছে, তখন অবশ্য এদিকে মানুষের বাস আছে। প্রফুল্ল সেই পথে চলিল। বাড়ি ফিরিয়া যাইতে ভয়, পাছে বাড়ি হইতে আবার তাকে ডাকাইতে ধরিয়া আনে। বাঘ-ভালুকে খায়, সেও ভালো, আর ডাকাইতের হাতে না পড়িতে হয়।

পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল- বেলা দশ দন্ড হইল, তবু গ্রাম পাইল না। শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত হইল - আর পথ পায় না। কিন্তু দুই একখানা পুরাতন ইঁট দেখিতে পাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল, যদি ইঁট আছে, তবে অবশ্য নিকটে মনুষ্যালয় আছে।

যাইতে যাইতে ইঁটের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

জঙ্গল দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল। শেষে প্রফুল্ল দেখিল, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রফুল্ল ইষ্টকস্তুপের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, এখনও দুই চারিটা ঘর অভগ্ন আছে। মনে করিল, এখানে মানুষ থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রফুল্ল সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেল। দেখিল সকল ঘরের দ্বার খোলা মনুষ্য নাই। অথচ মনুষ্যবাসের চিহ্নও কিছু আছে। ক্ষণপরে প্রফুল্ল কোনো বুড়ো মানুষের কাতরানি শুনিতে পাইল। শব্দ লক্ষ করিয়া প্রফুল্ল এক কুঠরিমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেখানে এক বুড়ো শুইয়া কাতরাইতেছে। বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষু কোটরগত, ঘন শ্বাস। প্রফুল্ল বুঝিল, ইহার মৃত্যু নিকট। প্রফুল্ল তাহার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, ‘‘মা তুমি কে ? তুমি কি কোনো দেবতা, মৃত্যুকালে আমার উদ্ধারের জন্য আসিলে ?’’

প্রফুল্ল বলিল, ‘‘আমি অনাথা। পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমিও দেখিতেছি অনাথ, তোমার কোনো উপকার করিতে পারি ?’’

বুড়া বলিল, ‘‘অনেক উপকার এ সময়ে করিতে পার। জয় নন্দদুলাল । এ সময়ে মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইলাম । পিপাসায় প্রাণ যায় - একটু জল দাও।’’

প্রফুল্ল দেখিল, বুড়ার ঘরে জল- কলশি আছে, কলশিতে জল আছে, জলপাত্র আছে, কেবল দিবার লোক নাই। প্রফুল্ল জল আনিয়া বুড়াকে খাওয়াইল।

বুড়ো জল পান করিয়া কিছু সুস্থির হইল। প্রফুল্ল এই অরণ্যমধ্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধকে একাকী এই অবস্থায় দেখিয়া বড়ো কৌতূহলী হইল। কিন্তু বুড়া তখন অধিক কথা কহিতে পারে না। প্রফুল্ল সুতরাং তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইল না। বুড়ো যে কয়টি কথা বলিল,তাহার মর্মার্থ এই-

বুড়া বৈষ্ণব। তাহার কেহ নাই, কেবল এক বৈষ্ণবী ছিল। বৈষ্ণবী বুড়াকে মুমূর্ষু দেখিয়া তাহার দ্রব্যসামগ্রী যাহা ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে । বুড়া বৈষ্ণব-তাহার দাহ হইবে না, বুড়ার কবর হয়-এই ইচ্ছা। বুড়ার কথামতো বৈষ্ণবী বাড়ির উঠানে তাহার একটি কবর কাটিয়া রাখিয়া দিয়াছে। হয়তো শাবল কোদালি সেইখানে পড়িয়া আছে। বুড়া এখন প্রফুল্লের কাছে এই ভিক্ষা চাহিল যে, ‘‘আমি মরিলে সেই কবরে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিয়ো।’’

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। তার পর বুড়া বলিতে লাগিল, ‘‘আমার কিছু টাকা পোঁতা আছে। বৈষ্ণবী সে সন্ধান জানিত না- তাহা হইলে, না লইয়া পালাইত না। সে টাকাগুলি কাহাকে না দিয়া গেলে আমার প্রাণ বাহির হইবে না। যদি কাহাকে না দিয়া মরি, তবে যক্ষ হইয়া টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইব- আমার গতি হইবে না, বৈষ্ণবীকে সেই টাকা দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সে তো পালাইয়াছে ? আর কোন্ মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইব ? তাই তোমাকেই সেই টাকাগুলি দিয়া যাইতেছি। আমার বিছানার নীচে একখানা চৌকাতক্তা পাতা আছে। সেই তক্তাখানি তুলিবে। একটা সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইবে। বরাবর সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নামিবে ভয় নাই-আলো লইয়া যাইবে। নীচে মাটির ভিতর এমনি একটা ঘর দেখিবে। সে ঘরের বায়ুকোনে খুঁজিয়ো-টাকা পাইবে।’’

প্রফুল্ল বুড়ার শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিল। বুড়া বলিল, ‘‘এই বাড়িতে গোহাল আছে - গোহালে গোরু আছে। গোহাল হইতে যদি দুধ দুইয়া আনিতে পার, তবে একটু আনিয়া আমাকে দাও, একটু আপনি খাও।’’

প্রফুল্ল তাহাই করিল- দুধ আনিবার সময় দেখিয়া আসিল কবর কাটা- সেখানে কোঁদালি শাবল পড়িয়া আছে।

অপরাহ্নে বুড়ার প্রাণবিয়োগ হইল। প্রফুল্ল তাহাকে তুলিল-বুড়া শীর্ণকায়, সুতরাং লঘু, প্রফুল্লের বল যথেষ্ট। প্রফুল্ল তাহাকে লইয়া গিয়া, কবরে শুয়াইয়া মাটি চাপা দিল। পরে নিকটস্থ কূপে স্নান করিয়া ভিজা কাপড় আধখানা পরিয়া রৌদ্রে শুকাইল। তার পরে কোঁদালি শাবল লইয়া বুড়ার টাকার সন্ধানে চলিল। বুড়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছে - সুতারাং লইতে কোনো বাধা আছে মনে করিল না। প্রফুল্ল দীন-দু:খিনী। কোথা হইতে কার ধন এখানে আসিল, তার পরিচয় আগে দিই।

২.

বুড়ার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। কৃষ্ণগোবিন্দ কায়স্থের সন্তান। সে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত, কিন্তু অনেক বয়সে একটা সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পড়িয়া, রসকলি ও খঞ্জনিতে চিত্ত বিক্রীত করিয়া, ভেক লইয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন প্রয়াণ করিল। এখন শ্রীবৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী ঠাকুরানি, সেখানকার বৈষ্ণবদিগের মধুর জয়দেব-গীতি, শ্রীমদ্ভাগবতে পাণ্ডিত্য, আর নধর গড়ন দেখিয়া, 'তৎপাদপদ্মনিকর' সেবন পূর্বক পুণ্যসঞ্চয়ে মন দিল। দেখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী লইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ তখন গরিব, বিষয় কর্মের অন্বেষণে মুর্শিদাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দের চাকরি জুটিল। কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবী যে বড়ো সুন্দরী, নবাব-মহলে সে সংবাদ পৌঁছিল। একজন হাবশি খোজা বৈষ্ণবীকে বেগম করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী লোভে পড়িয়া রাজি হইল। আবার বেগোছ দেখিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবাজি, বৈষ্ণবী লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কোথায় যান? কৃষ্ণগোবিন্দ মনে করিলেন, এ অমূল্য ধন লইয়া লোকালয়ে বাস অনুচিত। কে কোন দিন কাড়িয়া লইবে। তখন বাবাজী একটা নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পর্যটন করিতে করিতে এই ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, লোকের চক্ষু হইতে তাঁর অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে। এখানে যম ভিন্ন আর কাহারও সন্ধান রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহারা সেইখানে রহিল। বাবাজি সপ্তাহে সপ্তাহে হাটে গিয়া বাজার করিয়া আনেন। বৈষ্ণবীকে কোথাও বাহির হইতে দেন না।

এক দিন কৃষ্ণগোবিন্দ একটা নীচের ঘরে চুলা কাটিতেছিল,-মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা সেকেলে-তখনকার পক্ষেও সেকেলে মোহর পাইয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ সেখানে আরও খুঁড়িল। একভাঁড় টাকা পাইল।

এই টাকাগুলি না পাইলে কৃষ্ণগোবিন্দের দিন চলা ভার হইত। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দের এক নূতন জ্বালা হইল। টাকা পাইয়া তাহার স্মরণ হইল যে, এইরকম পুরাতন বাড়িতে অনেকে অনেক ধন মাটির ভিতর পাইয়াছে। কৃষ্ণ-গোবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এখানে আরও টাকা আছে। সেই অবধি কৃষ্ণগোবিন্দ অনুদিন প্রোথিত ধনের সন্ধান করিতে লাগিল। খুঁজিতে-খুঁজিতে অনেক সুড়ঙ্গ, মাটির নীচে অনেক চোরকুঠরি বাহির হইল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাতিকগ্রস্তের ন্যায় সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু পাইল না। এক বৎসর এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ কিছু শান্ত হইল। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে নীচের চোর-কুঠরিতে গিয়া সন্ধান করিত। একদিন দেখিল, এক অন্ধকার ঘরে, এক কোনে একটা কী চকচক করিতেছে। দৌড়িয়া গিয়া তাহা তুলিল-দেখিল, মোহর। ইঁদুরে মাটি তুলিয়াছিল, সেই মাটির সঙ্গে উহা উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ তখন কিছু করিল না, হাটবারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এবার হাটবারে বৈষ্ণবীকে বলিল, "আমার বড়ো অসুখ করিয়াছে, তুমি হাট করিতে যাও, "বৈষ্ণবী সকালে হাট করিতে গেল। বাবাজি বুঝিলেন, বৈষ্ণবী একদিন ছুটি পাইয়াছে শীঘ্র ফিরিবে না। কৃষ্ণগোবিন্দ সেই অবকাশে সেই কোন খুঁড়িতে লাগিল। সেখানে কুড়ি ঘড়া ধন বাহির হইল।

পূর্বকালে উত্তর- বাঙ্গালায় নীলধবজবংশীয় প্রবলপরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন। সে বংশে শেষ রাজা নীলাম্বর দেব। নীলাম্বরের অনেক রাজধানী ছিল- অনেক নগরে অনেক রাজভবন ছিল। এই একটি রাজভবন। এখানে বৎসরে দুই এক সপ্তাহ বাস করিতেন। গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তর-বাঙ্গালা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর বিবেচনা করিলেন যে, কী জানি, যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, তবে পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভালো। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পূর্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রত্নভান্ডার হইতে ধন সকল এইখানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। আর কেহ জানিল না যে কোথায় ধন রহিল। যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দি হইলেন। পাঠান-সেনাপতি তাঁহাকে গৌড়ে চালান করিল। তার পর আর তাঁহাকে মনুষ্যলোকে কেহ দেখে নাই। তাঁহার শেষ কী হইল কেহ জানে না। তিনি আর কখনও দেশে ফেরেন নাই। সেই অবধি ধনরাশি সেইখানে পোঁতা রহিল। সেই ধনরাশি কৃষ্ণগোবিন্দ পাইল। সুবর্ণ হীরক, মুক্তা অন্য রত্ন অসংখ্য অগণ্য, কেহ স্থির করিতে পারে না কত। কৃষ্ণগোবিন্দ কুড়ি ঘড়া এইরূপ ধন পাইল।

কৃষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পুঁতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে এক দিনের তরেও এ ধনের কথা কিছুই জানিতে দিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা হইতে একটি মোহর লইয়াও কখনও খরচ করিল না। এ ধন গায়ের রক্তের মতো মনে করিত। সেই ভাঁড়ের টাকাতেই কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল। সেই ধন এখন প্রফুল্ল পাইল। ঘড়াগুলি বেশ করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সেই বিচালির বিছানায় প্রফুল্ল শীঘ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইল।

৩.

প্রভাতে উঠিয়া প্রফুল্ল ভাবিল, "এখন কী করি? কোথায় যাই ? এ নিবিড় জঙ্গল তো থাকিবার স্থান নয়, এখানে একা থাকিব কী প্রকারে? যাইবা কোথায়? বাড়ি ফিরিয়া যাইব ? আবার ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আর যেখানে যাই, এ ধনগুলি লইয়া যাই কী প্রকারে? লোক দিয়া বহিয়া লইয়া গেলে, জানাজানি হবে, চোর ডাকাইতে কাড়িয়া লইবে। লোকই বা পাইব কোথায় ? যাহাকে পাইব, তাহাকেই বা বিশ্বাস কী ? আমাকে মারিয়া ফেলিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ ? এ ধনের রাশির লোভ কে সংবরণ করিবে?'

প্রফুল্ল অনেক বেলা অবধি ভাবিল। শেষে সিদ্ধান্ত এই হইল, "অদৃষ্টে যাহাই হউক, দারিদ্র্য-দু:খ আর সহ্য করিতে পারিব না। এইখানেই থাকিব। আমার পক্ষে দুর্গাপুরে আর এ জঙ্গলে তফাত কী ? সেখানেও আমাকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইতে ছিল, এখানেও না হয় তাই করিবে।"

এইরূপ মনস্থির করিয়া প্রফুল্ল গৃহ-কর্মে প্রবৃত্ত হইল। ঘর দ্বার পরিষ্কার করিল। গোরুর সেবা করিল। শেষে রন্ধনের উদ্যোগ, রাঁধিবে কী ? হাঁড়ি, কাঠ, চাল, ডাল সকলেরই অভাব। প্রফুল্ল একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে বাহির হইল। প্রফুল্লের যে সাহস অলৌকিক, তাহার পরিচয় অনেক দেওয়া হইয়াছে।

এ জঙ্গলে হাট কোথায় ? প্রফুল্ল ভাবিল, "সন্ধান করিয়া লইব।" জঙ্গলে পথের রেখা আছে,

পূর্বেই বলিয়াছি। প্রফুল্ল সেই রেখা ধরিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামানো। ব্রাহ্মন দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড়ো বেশি নয়। ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, ‘‘কোথা যাইবে, মা?’’

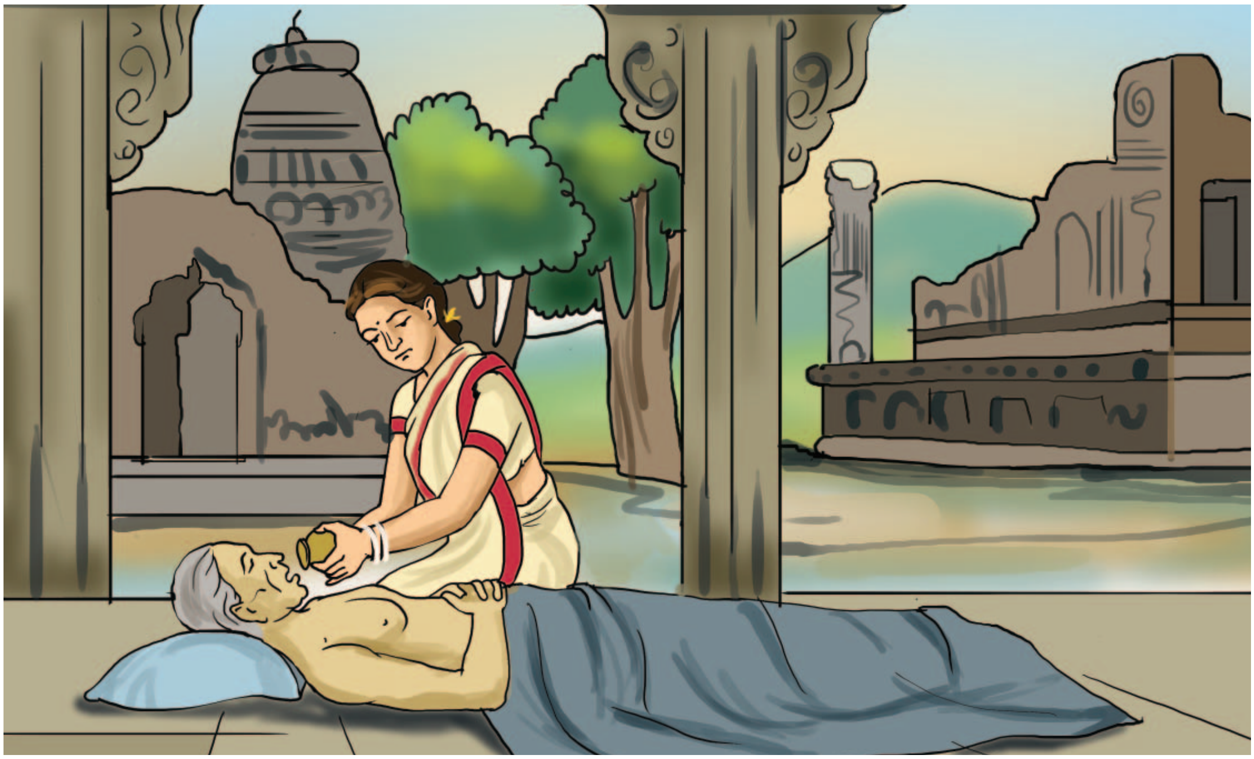

প্রফুল্ল : আমি হাটে যাইব।

ব্রাহ্মণ : এ দিকে হাটের পথ কোথা ?

প্রফুল্ল : তবে কোন্ দিকে ?

ব্রাহ্মণ : তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?

প্রফুল্ল : এই জঙ্গল হইতেই।

ব্রাহ্মণ : এই জঙ্গলে তোমার বাস ?

প্রফুল্ল : হাঁ।

ব্রাহ্মণ : তবে তুমি হাটের পথ চেন না ?

প্রফুল্ল : আমি নতুন আসিয়াছি।

ব্রাহ্মণ : এ বনে কেহ ইচ্ছাপূর্বক আসে না। তুমি কেন আসিলে ?

প্রফুল্ল : আমাকে হাটের পথ বলিয়া দিন।

ব্রাহ্মণ : হাট এক বেলার পথ। তুমি একা যাইতে পারিবে না। চোর ‘ডাকাইতের’ বড়ো ভয়। তোমার আর কে আছে ?

প্রফুল্ল : আর কেহ নাই।

ব্রাহ্মণ অনেক্ষণ ধরিয়া প্রফুল্লের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। মনে মনে বলিল, ‘‘এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা।

ভালো, দেখা যাউক ব্যাপারটা কী ? প্রকাশ্যে বলিল, ‘‘তুমি একা হাটে যাইও না। বিপদে পড়িবে। এইখানে আমার একখানা দোকান আছে। যদি ইচ্ছা হয় তবে সেখান হইতে চাল দাল কিনিতে পার।’’

প্রফুল্ল বলিল, ‘‘সেই হলে ভালো হয়। কিন্তু আপনাকে তো ব্রাহ্মণ পন্ডিতের মতো দেখিতেছি।’’

ব্রাহ্মণ : ব্রাহ্মণ পন্ডিত অনেক রকমের আছে। বাছা। তুমি আমার সঙ্গে এস। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া আরও নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্লের একটু ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু এ বনে কোথায় বা ভয় নাই? দেখিল সেখানে একখানি কুটির আছে- তালাচাবি বন্ধ, কেহ নাই। ব্রাহ্মণ তালাচাবি খুলিল। প্রফুল্ল দেখিল দোকান নয়, তবে হাঁড়ি, কলশি, চাল, দাল, নুন, তেল যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ বলিল, ‘‘তুমি যাহা একা বহিয়া লইয়া যাইতে পার লইয়া যাও ?’’ প্রফুল্ল যাহা পারিল, তাহা লইল। জিজ্ঞাসা করিল, ‘‘দাম কত দিতে হইবে ?’’

ব্রাহ্মণ : এক আনা।

প্রফুল্ল : আমার নিকট পয়সা নাই।

ব্রাহ্মণ : টাকা আছে ? দাও, ভাঙাইয়া দিতেছি।

প্রফুল্ল : আমার কাছে টাকাও নাই।

ব্রাহ্মণ : তবে কী নিয়া হাটে যাইতেছিলে?

প্রফুল্ল : একটি মোহর আছে।

ব্রাহ্মণ : দেখি।

প্রফুল্ল : মোহর দেখাইল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া ফিরাইয়া দিল, বলিল, ‘‘মোহর ভাঙাইয়া দিই, এত টাকা আমার কাছে নাই। চলো, তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে যাই, তুমি সেইখানে আমাকে পয়সা দিও।’’

প্রফুল্ল : ঘরেও আমার পয়সা নাই।

ব্রাহ্মণ : সবই মোহর। তা হাউক, চলো তোমার ঘর চিনিয়া আসি। যখন তোমার হাতে পয়সা হইবে, তখন আমায় দিয়ো। আমি গিয়া নিয়া আসিব।

এখন ‘‘সবই মোহর’’ কথাটা প্রফুল্লের কানে ভালো লাগিল না। প্রফুল্ল বুঝিল যে, এ চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে যে, প্রফুল্লের অনেক মোহর আছে। আর সেই লোভেই তাহার বাড়ি দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। প্রফুল্ল জিনিসপত্র যাহা লইয়াছিল, তাহা রাখিল। বলিল, ‘‘আমাকে হাটেই যাইতে হইবে। আমার কাপড়-চোপড়ের বরাত আছে।’’

ব্রাহ্মণ হাসিল। বলিল, ‘‘মা, মনে করিতেছ, আমি তোমার বাড়ি চিনিয়া আসিলে, তোমার মোহরগুলি চুরি করিয়া লইব? তা তুমি কি মনে করিয়াছ। হাটে গেলেই আমাকে এড়াইতে পারিবে? আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়িলে তুমি ছাড়িবে কী প্রকারে?

সর্বনাশ ! প্রফুল্লের গা কাঁপিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বলিল, ‘‘তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিব না। আমাকে ব্রাহ্মণপন্ডিত মনে কর, আর যাই মনে কর, আমি ডাকাইতের সর্দার। আমার নাম ভবানী পাঠক।’’

প্রফুল্ল স্পন্দনহীন। ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল। ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। প্রফুল্লের বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

ভবানী বলিল, ‘‘বিশ্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ।’’

এই বলিয়া ভবানী ঘরের ভিতর হইতে একটা নাগরা বা দামামা বাহির করিয়া তাহাতে গোটা কতক ঘা দিল। মুহূর্তমধ্যে জন পঞ্চাশ ষাট কালান্তক যমের মতো জওয়ান লাঠি সড়কি লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘‘কী আজ্ঞা হয়?’’

ভবানী বলিল, ‘‘এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখো। ইহাকে আমি মা বলিয়াছি। ইহাকে তোমরা সকলে মা বলিবে এবং মার মতো দেখিবে। তোমরা ইহার কোনো অনিষ্ট করিবে না। আর কাহাকেও করিতে দিবে না। এখন তোমরা বিদায় হও।’’এই বলিবামাত্র সেই দস্যুদল মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

প্রফুল্ল বড়ো বিস্মিত হইল। প্রফুল্ল স্থিরবুদ্ধি, একেবারেই বুঝিল যে ইহার শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিল, চলুন, আপনাকে আমার বাড়ি দেখাইতেছি।’’

প্রফুল্ল দ্রব্যসামগ্রী যাহা রাখিয়াছিল তাহা আবার লইল, সে আগে চলিল, ভবানী পাঠক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা সেই ভাঙা বাড়িতে উপস্থিত হইল। বোঝা নামাইয়া ভবানী ঠাকুরকে বসিতে, প্রফুল্ল একখানা ছেঁড়া কুশাসন দিল। বৈরাগীর একখানি ছেঁড়া কুশাসন ছিল।

৪.

ভবানী পাঠক বলিল, ‘‘এই ভাঙা বাড়িতে তুমি মোহর পাইয়াছ?’’

প্রফুল্ল : আজ্ঞে হাঁ।

ভবানী : কত?

প্রফুল্ল : অনেক।

ভবানী : ঠিক বলো কত? ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে আমার লোক আসিয়া বাড়ি খুঁজিয়া দেখিবে।

প্রফুল্ল : কুড়ি ঘড়া।

ভবানী : এ ধন লইয়া তুমি কী করিবে?

প্রফুল্ল : দেশে লইয়া যাইব।

ভবানী : রাখিতে পারিবে?

প্রফুল্ল : আপনি সাহায্য করিলে পারি।

ভবানী : এই বনে আমার পূর্ণ অধিকার। এই বনের বাহিরে আমার তেমন ক্ষমতা নাই। এ বনের বাহিরে ধন লইয়া গেলে, আমি রাখিতে পারিব না।

প্রফুল্ল : তবে আমি এই বনেই এই ধন লইয়া থাকিব। আপনি রক্ষা করিবেন?

ভবানী : করিব। কিন্তু তুমি এত ধন লইয়া কী করিবে?

প্রফুল্ল : লোকে ঐশ্বর্য লইয়া কী করে?

ভবানী : ভোগ করে।

প্রফুল্ল : আমিও ভোগ করিব।

ভবানী : ঠাকুর ‘‘হো হো।’’ করিয়া হাসিয়া উঠিল প্রফুল্ল অপ্রতিভ হইল। দেখিয়া ভবানী বলিল, ‘‘মা।

বোকা মেয়ের মতো কথা বলিলে, তাই হাসিলাম। তোমার তো কেহই নাই বলিয়াছ, তুমি কাকে নিয়া এ ঐশ্বর্য ভোগ করিবে? একা কি ঐশ্বর্য ভোগ হয়?''

প্রফুল্ল অধোবদন হইল। ভবানী বলিতে লাগিল, ''শোনো। লোকে ঐশ্বর্য লইয়া কেহ ভোগ করে, কেহ পুন্যসঞ্চয় করে, কেহ নরকের পথ সাফ করে। তোমার ভোগ করিবার জো নাই। কেন-না, তোমার কেহ নাই। তুমি পুন্যসঞ্চয় করিতে পার, না হয় নরকের পথ সাফ করিতে পার। কোনটা করিবে?''

প্রফুল্ল বড়ো সাহসী। বলিল, ''এ সকল কথা তো ডাকাইতের সর্দারের মতো নহে।''

ভবানী : না, আমি কেবল ডাকাইতের সর্দার নহি। তোমার কাছে আর আমি ডাকাইতের সর্দার নহি, তোমাকে আমি মা বলিয়াছি, সুতরাং, আমি এক্ষণে তোমার পক্ষে ভালো যা, তাই বলিব। ধনের ভোগ তোমার হইতে পারে না-কেন-না, তোমার কেহ নাই। তবে এই ধনের দ্বারা বিস্তর পাপ, অথবা বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় করিতে পার। কোন্ পথে যাইতে চাও?

প্রফুল্ল : যদি বলি পাপই করিব?

ভবানী : আমি তাহা হইলে লোক দিয়া, তোমার ধন তোমার সঙ্গে দিয়া তোমাকে এ বনের বাহির করিয়া দিব। এ বনে আমার অনুচর এমন অনেক আছে যে, তোমার এই ধনের লোভে তোমার সঙ্গে পাপাচরণ করিতে সম্মত হইবে। অতএব তোমার সে মতি হইলে, আমি তোমাকে এই দন্ডে এখান হইতে বিদায় করিতে বাধ্য। এ বন আমারই।

প্রফুল্ল : লোক দিয়া আমার ধন আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, তবে সে আমার পক্ষে ক্ষতি কী?

ভবানী : রাখিতে পারিবে কী ? তোমার রূপ আছে যৌবন আছে, যদিও ডাকাইতের হাতে উদ্ধার পাও- কিন্তু রূপ- যৌবনের হাতে উদ্ধার পাইবে না। পাপের লালসা না ফুরাইতে ফুরাইতে ধন ফুরাইবে। যতই কেন ধন থাকনা, শেষ করিলে শেষ হইতে বিস্তর দিন লাগে না। তার পর, মা?

প্রফুল্ল : তার পর কী?

ভবানী : নরকের পথ সাফ। লালসা আছে, কিন্তু লালসা পরিতৃপ্তির উপায় নাই- সেই নরকের পরিষ্কার পথ। পুণ্য সঞ্চয় করিবে ?

প্রফুল্ল : বাবা। আমি গৃহস্থের মেয়ে কখনও পাপ জানি না। আমি কেন পাপের পথে যাইব ? আমি বড়ো কাঙাল- আমার অন্নবস্ত্র জুটিলেই ঢের, আমি ধন চাই না- দিনপাত হইলেই হইল। এ ধন তুমি সব নাও - আমি নিষ্পাপে যাতে এক মুঠো অন্ন পাই তাই ব্যবস্থা করিয়া দাও।

ভবানী মনে মনে প্রফুল্লকে ধন্যবাদ করিল। প্রকাশ্যে বলিল, "ধন তোমার। আমি লইব না।"

প্রফুল্ল বিস্মিত হইল। মনের ভাব বুঝিয়া ভবানী বলিল, "তুমি ভাবিতেছ, ডাকাইতি করে, পরের ধন কাড়িয়া খায়, আবার এরকম ভান কেন ? সে কথা তোমাকে এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে তুমি যদি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হও, তবে তোমার এ ধন লুঠ করিয়া লইলেও লইতে পারি। এখন এ ধন লইব না। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি - এ ধন লইয়া তুমি কী করিবে?"

প্রফুল্ল : আপনি দেখিতেছি জ্ঞানী, আপনি আমায় শিখাইয়া দিন, ধন লইয়া কী করিব ?

ভবানী : শিখাইতে পাঁচ সাত বৎসর লাগিবে। যদি শেখ, আমি শিখাইতে পারি। এই পাঁচ সাত বৎসর তুমি ধনস্পর্শ করিবে না। তোমার ভরনপোষনের কোনো কষ্ট হইবে না। তোমার খাইবার পরিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে, দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিতে হইবে । কেমন, স্বীকৃত আছ?

প্রফুল্ল : বাস করিব কোথায় ?

ভবানী : এইখানে। ভাঙাচোরা একটু একটু মেরামত করিয়া দিব।

প্রফুল্ল : এইখানে একা বাস করিব ?

ভবানী : না, আমি দুইজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিব। তাহারা তোমার কাছে থাকিবে। কোনো ভয় করিও না। এ বনে আমি কর্তা, আমি থাকিতে তোমার কোনো অনিষ্ট ঘটিবে না।

প্রফুল্ল : আপনি কিরূপে শিখাইবেন ?

ভবানী : তুমি লিখিতে - পড়িতে জান ?

প্রফুল্ল : না।

ভবানী : তবে প্রথমে লেখা পড়া শিখাইব।

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। এ অরণ্যমধ্যে একজন সহায় পাইয়া সে আহ্লাদিত হইল।

ভবানী ঠাকুর বিদায় হইয়া সেই ভগ্ন অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, চৌগোঁপ্পা ও ছাঁটা গালপাট্টা আছে। ভবানী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঙ্গরাজ! এখানে কেন ?"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপনার সন্ধানে? আপনি এখানে কেন?"

ভবানী : যা এতদিন সন্ধান করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি।

রঙ্গরাজ : রাজা?

ভবানী : রাণি।

রঙ্গরাজ : রাজা রাণি আর খুঁজিতে হইবে না। ইংরেজ রাজা হইতেছে। কলিকাতায় না কি হস্টিন বলিয়া

একজন ইংরেজ ভালো রাজ্য ফাঁদিয়াছে।

ভবানী : আমি সেরকম খুঁজি না । আমি খুঁজি যা, তা তো তুমি জান।

রঙ্গরাজ : এখন পাইয়াছেন কি ?

ভবানী : সে সামগ্রী পাইবার নয়, তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষে কাটারি গড়িয়া লয়। ইস্পাত ভালো পাইয়াছি, এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে। দেখিয়ো, এই বাড়িতে আমি ভিন্ন আর কোনো পুরুষমানুষ না প্রবেশ করিতে পায়। মেয়েটি যুবতি এবং সুন্দরী।

রঙ্গরাজ : যে আজ্ঞা। সম্প্রতি ইজারাদারের লোক রঞ্জনপুর লুঠিয়াছে। তাই আপনাকে খুঁজিতেছি।

ভবানী : চলো, তবে আমরা ইজারাদারের কাছারি লুঠিয়া গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়া আসি। গ্রামের লোক আনুকূল্য করিবে ?

বঙ্গরাজ : বোধ হয় করিতে পারে। (সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ

ভরসা = আস্থা
বৈষ্ণব = বিষ্ণুর উপাসক
মোহর = স্বর্ণমুদ্রা
অপ্রতিভ = লজ্জিত
অন্বেষণ = খোঁজ
অদৃষ্ট = ভাগ্য
নিরীক্ষণ = মনোযোগ সহ দেখা
অপারাহ্ণ = বিকেল
প্রয়ান = প্রস্থান
ভাঁড়াভাড়ি = গোপন করা
ঐশ্বর্য = সম্পদ
সংবরণ = নিবারণ
শীর্ণ = রোগা
ভেক = ছদ্মবেশ
প্রতীক্ষা = অপেক্ষা
অনিষ্ট = ক্ষতি
অনুচর = অনুগামী
ঢের = যথেষ্ট

অনুশীলনী

১. আকলন

নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করো :-

অ) ছক পূর্ণ করো :-

(১)

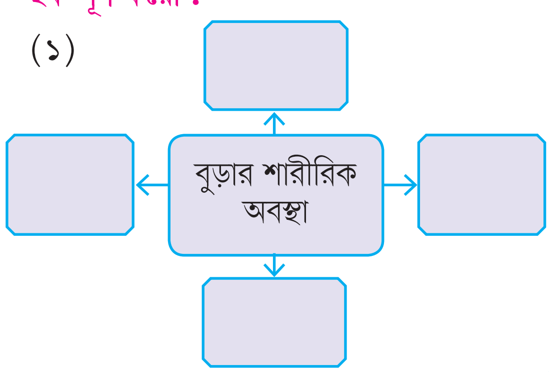

(২)

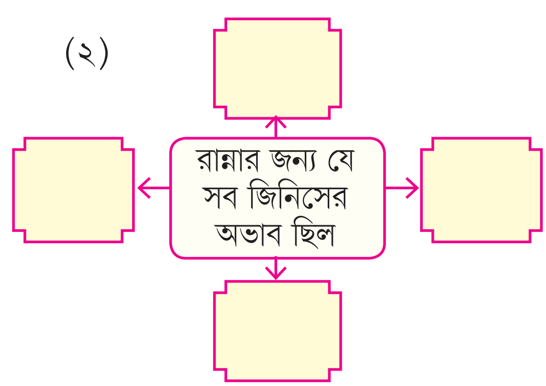

(৩)

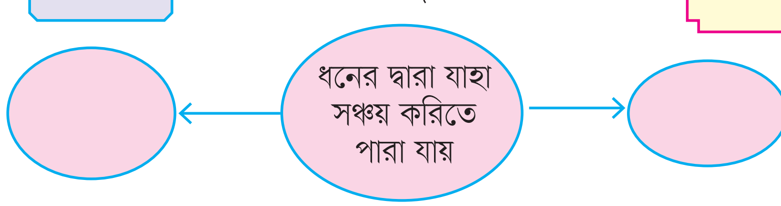

আ) কারণ লেখ :-

(১) বৈষ্ণবী বাড়ির উঠানে একটি কবর কেটে রেখে দিয়েছে...

(২) কৃষ্ণ গোবিন্দ একটা নিভৃত স্থান খোঁজ করতে লাগলেন...

(৩) কৃষ্ণগোবিন্দ হাটবারের অপেক্ষা করতে লাগলেন...

২. শব্দ সম্পদ

অ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখ :-

উপস্থিত, স্পষ্ট, উপকার, অশান্ত, মূর্খ, গণ্য, কুখ্যাত, অল্প, অস্বীকৃত

আ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো :-

অন্বেষণ, যথেষ্ট, সপ্তাহ, পূর্বকাল, ধনরাশি, স্বহস্ত, বাক্য স্ফূর্তি, পাপাচরণ, জনৈক, পরস্পর।

ই) ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখ :-

সপ্তাহ, নীলাম্বর, রত্নভাণ্ডার, মাতাপিতা, চৌরাস্তা, চোরডাকাত, দেবদানব, জনবিরল।

৩. অভিব্যক্তি

অ) 'বালিকা-শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত'- এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) 'পণপ্রথা' একটি সামাজিক ব্যাধি, এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৪. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) প্রফুল্লকে ইস্পাতের মেয়ে বলা হয়েছে কেন?

আ) কৃষ্ণগোবিন্দ বনের মধ্যে কেন বাস করতেন?

ই) কৃষ্ণ গোবিন্দ প্রফুল্লকে বিপুল সম্পত্তির অধিকার দিয়েছিলেন কেন ?

ঈ) প্রফুল্ল কীভাবে কৃষ্ণগোবিন্দকে আবিষ্কার করেছিল?

উ) প্রফুল্লের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

ঊ) ভবানী পাঠকের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৫. সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

অ) প্রফুল্ল কার কাতরানি শুনতে পেয়েছিল?

আ) বুড়া প্রফুল্লের নিকট কী ভিক্ষা চেয়েছিল?

ই) বৈষ্ণবী কোন সময়ে হাট করিতে গিয়েছিল?

ঈ) অনেক বেলা অবধি ভেবেছিল কে ?

উ) চতুর ব্রাহ্মণ কী বুঝেছিল?

ঊ) ইস্পাত বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

১১. রাস্তা কারও একার নয়

- বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবি পরিচিতি

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বিক্রমপুরে ২ রা সেপ্টেম্বর, ১৯২০ সালে। পিতা হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা সুরবালা দেবী। তার পাঠ্যজীবন অতিবাহিত হয় জগবন্ধু ইন্সটিটিউশন, রিপন কলেজিয়েট স্কুল ও রিপন কলেজে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম জীবন থেকেই প্রগতিশীল মনোভাবের মানুষ ছিলেন, যদিও গোঁড়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান তিনি। পাঠ্যজীবনেই দেশাত্মবোধে অনুপ্রানিত হন। অসহায় দীন-দু:খী, দারিদ্র্যপীড়িত কৃষক-শ্রমিকের প্রতি তার অকৃত্রিম মমত্ব তাঁর কবিতায় স্বতোৎসারিত। তার দীর্ঘ কাব্য সাধনায় ওই মর্মবাণী নানারূপে, নানা ভাবে প্রকাশিত। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে যখন তার বয়স মাত্র বাইশ বৎসর। কাব্যগ্রন্থের নাম 'গ্রহচ্যুত'। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল, উলুখড়ের কবিতা (১৯৫৪) লখিন্দর (১৯৫৩) তিন পাহাড়ের স্বপ্ন (১৯৬৩) মহাদেবের দুয়ার (১৯৬৭) ইত্যাদি। কবি 'উল্টোরথ', 'নরসিংহ দাস' স্মৃতি পুরস্কার- ও রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হন। কবি প্রয়াত হন ১১ই জুলাই ১৯৮৫ সালে।

কবিতার মূলকথা

ধর্ম বিজ্ঞানকে রাস্তা ছাড়তে বললে বিজ্ঞান কি তার হুকুম মেনে রাস্তা ছাড়ে ? পোপ হলেন খ্রিষ্ট ধর্মগুরু। ধর্ম বিজ্ঞানের আগমনকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ। বিজ্ঞানের উপর খবরদারিতে ধর্মের অক্ষমতা। ধর্ম কল্যাণ ও অকল্যাণকর রূপে ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণ ও অকল্যাণকর দিকও আছে। মানুষ যার যার পছন্দমত দিক বেছে নিতে পারে। পৃথিবীতে যতদিন গান থাকে, থাকে স্বপ্ন, ততদিন কেউ কাউকে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। রাস্তা কারও একার নয়।

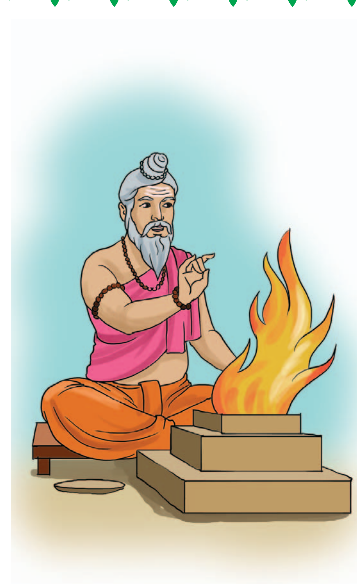

ধর্ম যখন বিজ্ঞানকে বলে, 'রাস্তা ছাড়ো।' বিজ্ঞান কি রাস্তা ছেড়ে দেয় ?
পোপের ভয়ে দেশান্তরী হয়েছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।
সারাদিন একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতেন গ্যালিলিও
গ্যালিলেই;
তাকে পাহারা দেবার জন্য বসে থাকতো একজন ধর্মের পেয়াদা,
যার চোখের পাতা বাতাসেও নড়তো না।

বিজ্ঞান কি তখন থেমেছিল ? তীর্থের পান্ডাদের হই হই,
তাদের লাল চোখ কি পেরেছিল পৃথিবীকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে,
সূর্যকে তার চারদিকে ওঠবোস করাতে ?

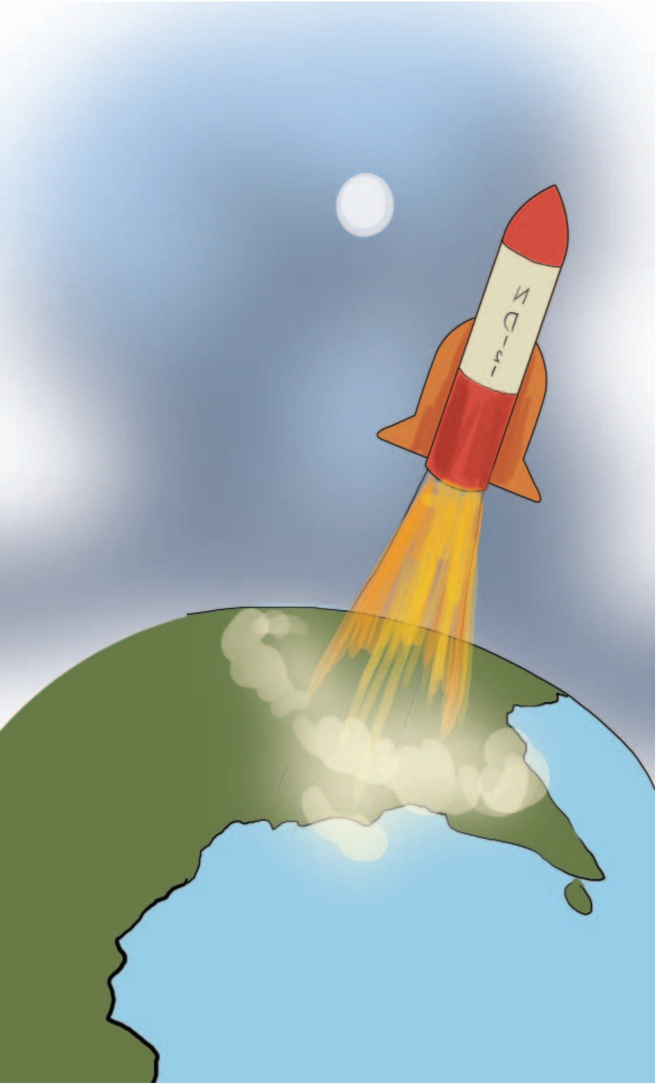

ধর্ম যতদিন দু:খী মানুষকে বেঁচে থাকার সাহস দেয়,
ততদিন রাস্তা নিয়ে কারও সঙ্গে তার ঝগড়া থাকে না।
রাস্তা কারও একার নয়। বরং তাকেই একদিন রাস্তা ছাড়তে হয়,
যার স্পর্ধা আকাশ ছুয়ে যায়।

বিজ্ঞান যখন প্রেমের গান ভুলে ভাড়াটে জল্লাদের পোশাক গায়ে
চাপায়,
আর রাজনীতির বাদশারা পয়সা দিয়ে তার ইজ্জত কিনে নেয়,
আর তার গলা থেকেও ধর্মের ষাঁড়েদের মতোই কর্কশ আদেশ
শোনা যায়, 'রাস্তা ছাড়ো। নইলে-'

পৃথিবীর কালো সাদা হলুদ মানুষের গান,
তাদের স্বপ্ন এক মুহূর্ত সেই চিৎকার শুনে থমকে তাকায়।
তারপর যার যেদিকে রাস্তা, সেদিকে মুখ করেই তারা সামনে,
আরও সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

কেউ কারোকে রাস্তা ছেড়ে দেয় না,
যতদিন এই পৃথিবীতে গান থাকে গানের মানুষ থাকে, স্বপ্ন থাকে...

শব্দার্থ

ধর্ম = ঈশ্বর বিষয়ক উপাসনা পদ্ধতি ও আচরণবিধি। **স্পর্ধা** = অহংকার
বিজ্ঞান = পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রমাণিত বিশেষ সত্য কিংবা লব্ধজ্ঞান।
পোপ = খ্রিস্টধর্মগুরু **দেশান্তরী** = অন্যদেশে চলে যাওয়া **পেয়াদা** = চাপরাশি
বাদশা = সম্রাট **পান্ডা** = তীর্থ ক্ষেত্রের পূজারি **কর্কশ** = সুরহীন

অনুশীলনী

১. আকলন

অ) ছক পূর্ণ করো :-

(১) [ ] ← তীর্থের পান্ডাদের যা যা পৃথিবীকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে সূর্যকে তার চারিদিকে ওঠবোস করাতে পারেনি। → [ ]

আ) কারণ লেখ :-

(১) লিওনার্দো দা ভিঞ্চি দেশান্তরী হয়েছিলেন... (২) বিজ্ঞানকে একদিন রাস্তা ছাড়তে হয়...

(৩) ধর্মের পেয়াদাদের চোখ বাতাসেও নড়তো না...

২. শব্দ সম্পদ

অ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখ :-

ধর্ম, ভয়, অন্ধকার, বাঁচা, কেনা

৩. কাব্যসৌন্দর্য

অ) যে পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে অহংকারের পতন হয় সেই পঙ্‌ক্তির অর্থ লেখ।

আ) যে পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে মানুষের গান বেঁচে থাকার, আশার কথা বলা হয়েছে সেই পঙ্‌ক্তির অর্থ লেখ।

৪. অভিব্যক্তি

অ) ''মানবতাই সব থেকে বড়ধর্ম'' - এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) ''বিজ্ঞানের সদুপযোগ ছাড়া মানব জাতির রক্ষা নেই।''- এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

ই) ''মানুষের জীবনে ধর্ম এবং বিজ্ঞান উভয়ই প্রয়োজন।'' - এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৫. রসাস্বাদন

অ) সারাদিন অন্ধকার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতেন কে ও কেন?

আ) বিজ্ঞান সম্পর্কে কবির বক্তব্য তোমার ভাষায় লেখো।

ই) কবিতার মুখ্য বিষয় ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করো।

ঈ) 'রাস্তা কারও একার নয়' কবিতার নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করো।

৬. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) রাস্তা কারও একার নয় কবিতার মর্মার্থ লেখ ?

আ) গ্যালিলিও কেন একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতেন?

ই) ''রাস্তা ছাড়ো ! নইলে - '' এ আদেশ কার ? কী প্রসঙ্গে এ আদেশ শোনা যায় তাহা লেখ।

ঈ) ''যেদিকে রাস্তা সেদিকে মুখ করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়''... কারা ও কেন?

৭. সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

অ) লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কে ? আ) গ্যালিলিও কে ?

ই) কে দেশান্তরী হয়েছিল ? ঈ) কার একদিন রাস্তা ছাড়তে হয়?

উ) জল্লাদের পোশাক গায়ে চাপায় কে ? ঊ) কার স্পর্ধা আকাশ ছুঁয়ে যায় ?

১২. শুভ উৎসব

- বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন ভারতীয় লেখক ও কবি ছিলেন। তিনি ১৮৭০ খিস্টাব্দে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা প্রফুল্লময়ী দেবী। তিনি খুব তরুণ বয়সে লিখতে শুরু করেন। তিনি 'ভারতী', 'সাধনা', বলাকা' প্রভৃতি নিবন্ধ লিখেছেন। তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে মারা যান। তাঁর অসমাপ্ত লেখা, কাকা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পন্ন করেন।

পাঠের মূলকথা

লেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে চেয়েছেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদের পুরাতন বিচিত্র উৎসব - কলা বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আগেরকার দিনে উৎসবের সময় সকলের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এখনকার উৎসবে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। লেখক বলেছেন আমাদের উৎসবে অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা এবং কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। উৎসবের উদ্দেশ্য হলো নিজের সৌভাগ্যসুখ সকলের সহিত বন্টন করা। বাইরের সমারোহ, উৎসবের প্রধান অঙ্গ না হয়ে ভাবের প্রাধান্য প্রবল হলে উৎসব শুভ হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আর যাহাই হউক, আমাদের পুরাতন বিচিত্র উৎসব-কলা যে ক্রমশ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই। এখনকার উৎসবগুলি ক্রমশই যেন আপিসি ছাঁদে গঠিত হইয়া উঠিতেছে- তাহার মধ্যে দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাঙ্গামা যত অধিক, আনন্দ আর সে পরিমাণে নাই। পূর্বে যে দেনাপাওনার সম্বন্ধ আদৌ ছিল না তাহা নহে, এবং হয়তো সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে আর্থিক সম্বন্ধ তখনও এখনকার মতো প্রবল ছিল, কিন্তু অন্য প্রকার সম্বন্ধের আবরণে এই হিসাবি সম্বন্ধটা তখন কোথাও বড়ো প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া উঠে নাই। ব্রাহ্মণ ফলাহারের পর দক্ষিণা না লইয়া বাড়ি ফিরিতেন না। কিন্তু দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এমন একটি মধুর সম্বন্ধ ছিল যে, দক্ষিণার আর্থিকতা তাহার মধ্যে স্থান পাইত না। মন্ত্রপাঠের ব্রাহ্মণ হইতে শুরু করিয়া কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, হাঁড়ি, ডোম পর্যন্ত সকলেই নিজ নিজ মর্যাদানুসারে উৎসবাঙ্গে স্থান নির্দিষ্ট ছিল- কাহাকেও বাদ দিলে চলিত না।

কিন্তু এখন ইংরেজি পণ্যশালার অনুগ্রহে যান্ত্রিকভাবেই অনেক কার্য নি:শব্দে সমাধা হইয়া উঠে। এক কলমের আঁচড়ে হ্যারিসন হ্যাথওয়ে, হোয়াইট্যাওয়ে লেডল, অস্লর ল্যাজারাসের ভবন হইতে যাহা কিছু আবশ্যক আনাইয়া লওয়া যায়, এমনকি নাপিত, পাচক, পরিষেবকাদি সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমাদের পণ্যক্রিয়ার মধ্যে সজীব সহৃদয় মনুষ্যত্বের মধুর সংস্পর্শে যে একটি নিগূঢ় আনন্দ ছিল, ইহাতে সেটুকু দিতে পারে না স্বীকার করিতে হয়। - তখনকার দিনে বড়োলোকের বাটীতে কোনো ক্রিয়াকর্মোপলক্ষে মাসেককাল পূর্ব হইতে নানাবিধ পণ্যভার লইয়া দোকানি-পসারিরা গতিবিধি শুরু করিত। শালওয়ালা ভালো ভালো

কাশ্মীরীশাল ও রুমাল লইয়া আসিত, মুর্শিদাবাদ ও ঘাটাল অঞ্চলের বণিকেরা নানাবিধ গরদ তসর ও রেশমি বস্ত্র আমদানি করিত। ঢাকা, শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গা, সিমলার ব্যাপারীরা কত প্রকারের সূক্ষ্ম ও বিচিত্রপাড় কার্পাস বস্ত্র এবং পশ্চিমি ক্ষেত্রীরা বেনারসি ও চেলির জোড় লইয়া উপস্থিত হইত। এতদ্ভিন্ন, স্বর্ণকার কর্মকার মালাকার ময়রা গোয়ালা পাথরওয়ালা কাংস্য-পিত্তলবিক্রেতা- নানান জনে নানাবিধ ফরমাসে নিত্য গতায়াত করিত। এমনকি, বেদানার বস্তা লইয়া বিদেশি কাবুলিওয়ালা পর্যন্ত বাদ যাইত না। কিন্তু এ গতিবিধি নিতান্তই বাহিরের লোকের মতো ছিল না, এবং এই খরিদ বিক্রয়টুকুর মধ্যেই তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইত না, সকলেই উৎসাহসহকারে উৎসবের নানাবিধ অনুষ্ঠান-বিষয়ে পাঁচটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, মন্তব্য দিত, প্রশ্ন করিত, কোথায় কী হইবে না- হইবে দেখিয়া-শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কাজের দিনে বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেপুলেগুলিকে লইয়া উৎসব দেখিতে আসিত, এবং পুরাতন কাবুলিওয়ালা তাহার শখের জরির কোর্তা গায়ে দিয়া প্রসন্নমুখে দ্বারদেশে আসিয়া প্রহরী হইয়া দাঁড়াইত। নিতান্ত জড়-বিনিময় মাত্র না হইয়া আমরা তাহাদের পণ্যসামগ্রীর সহিত অন্তরের শুভ প্রীতিও অনেকখানি করিয়া লাভ করিতাম, এবং মুদ্রাখণ্ডের সহিত উৎসবের ভাগও কতক পরিমাণে দিতাম। এই যে অন্তরে অন্তরে 'ফাউ' আদান-প্রদানটুকু ইহাতেই বিশেষ আনন্দ এবং এইটুকুর জন্যই আমাদের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধে হীনতা সহজে দেখা যাইত না।

কেবলই যে বাহিরে বাহিরে এইরূপ গতিবিধি ও আদান - প্রদান ছিল তাহাও নহে । অন্ত:পুরে কুম্ভকারপত্নী নূতন বরনডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত, মালিনী নিত্য নব নব ফুলভার যোগাইত এবং ফুলসজ্জার জন্য নূতন নূতন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত, নাপতানী দিদিঠাকুরানী ও বধূঠাকুরানিদিগের কোমল পদপল্লবে ঝামা ঘষিয়া আলতা পরাইয়া দিয়া যাইত, তাঁতিনি নূতন-নূতন পাড়ের মনোহারিণী নীলাম্বরী ও বিচিত্র বর্নের শাটিকা লইয়া আসিত। গোয়ালিনি মধ্যাহ্নভোজনান্তে, আর কিছু না হউক, গোয়ালপাড়ার দুইটি মন্তব্য শুনাইয়া যাইত এবং পাড়ার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণঠাকুরানি স্বহস্তকর্তিত কয়গাছি পৈতার সুতা আনিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসিতেন। এই এতগুলি বর্ষীয়সী ও যুবতী-সমাগম যে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে সাধিত হইত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। হাস্যপরিহাস, গল্পগুঞ্জন, সমালোচনা, বিধিব্যবস্থা নির্ধারণ ও নানা অনাবশ্যক উপদেশ পরামর্শ বিচার প্রসঙ্গে বয়স ও অবস্থার তারতম্য ঘুচিয়া গিয়া সকলের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও সরস হইয়া উঠিত- দেনা-পাওনার সম্বন্ধটুকু আদৌ প্রকাশ পাইত না। সকলেই যেন আত্মীয়-পরিজনবর্গের মধ্যে- যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের নানা অঙ্গ।

এইরূপে আমাদের প্রত্যেকের কোনো শুভানুষ্ঠানের মধ্যে অলক্ষিতে এই এতগুলি লোকের শুভকামনা কার্য করিত, এবং ইহাতেই আমাদের সামান্য ক্রিয়াকর্মও বৃহৎ উৎসবে পরিণত হইত। নব্যতন্ত্র রজতচক্রকে যেরূপ সকল সম্বন্ধের মধ্যবিন্দু করিয়া তুলিতে চাহে, তখন তাহা ছিল না। ধনের পদমর্যাদা যথেষ্ট থাকিলেও গৌরবকে, প্রীতির সম্বন্ধকে সে লঙ্ঘন করিতে পারিত না। এমনকি, বেতনভুক সামান্য দাস-দাসীদিগকেও সংসারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে দেখা হইত, এবং সুগৃহিণী ইহাদের কেহ ক্ষুধিত থাকিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই যে হৃদ্যতাটুকু- এই যে ব্যাথার ব্যথী ভাব - ইহা আর কিছুতেই থাকে না। পূর্বে যেখানে প্রীতিসূচক আত্মীয়তাই স্বাভাবিক ছিল, এক্ষণে সেখানে নিকট সম্বন্ধ স্থাপণেই অনেক

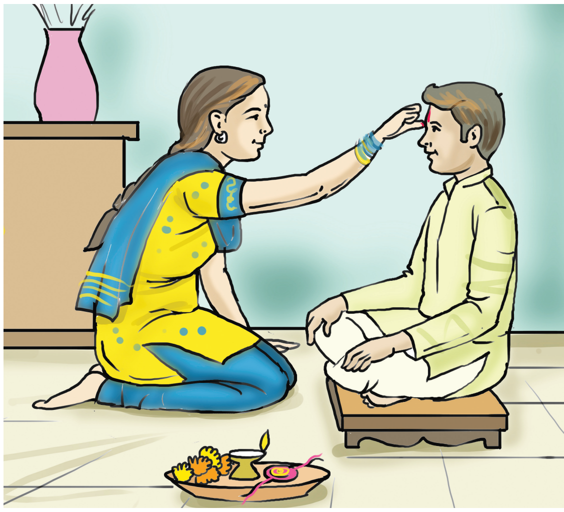

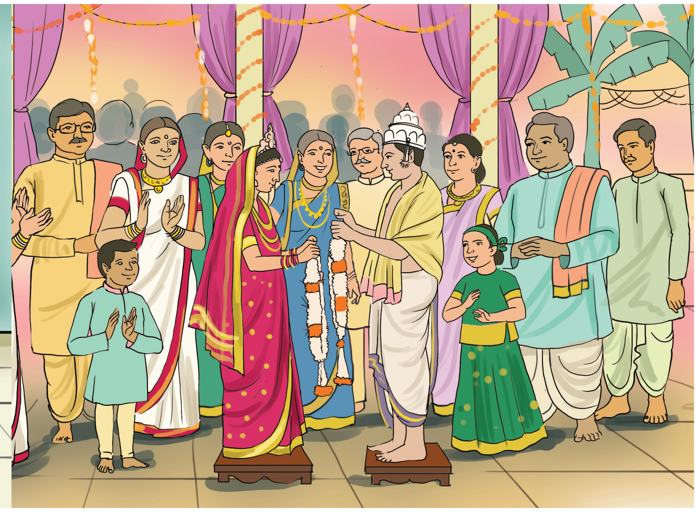

সময় অত্যন্ত অশোভন ও অসংগত বলিয়া ঠেকে। আশ্রিতজন এক্ষণে পূর্বের ন্যায় হৃদয়ের আশ্রয় আর বড়ো পায় না, এবং আশ্রয়দাতাও তাহাদের হৃদয়ের অধীশ্বরত্ব হইতে বঞ্চিত হয়েন। অন্তরে-অন্তরে কাহারও সহিত কাহারও কোনোরূপ অনিবার্য যোগ নাই।

আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা। সমারোহসহকারে আমোদপ্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না। কিন্তু তাহার মধ্যে সর্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়। উৎসব প্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুণ্ণ হয়। যাত্রা হউক, কথা হউক, রামায়ণ গান হইক বা চণ্ডীপাঠ হউক- যখন যাহা হয় উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গনে আসিয়া সর্বসাধারণে তাহাতে অকাতরে যোগাদান করে, এবং সকলের সহিত একত্র হইয়া গৃহকর্তা তাহা উপভোগ করেন।

যাহাতে আমার নিজের কিছুমাত্র আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকু যখন দশজনের মধ্যে বিতরণ করিতে চাই, তখন উপলক্ষের অভাব ঘটিবার কোন কারণ দেখা যায় না। আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি- 'এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।' অনেক ছোটোখাটো বিষয়েও আমি হয়তো একটুকু আনন্দ পাই- নিজের বাড়ি খানি হইলে সুখী হই, পুষ্করিণীটি থাকিলে ভালো লাগে, গোরুগুলির কল্যাণ কামনা করি- গৃহপ্রবেশ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠাষ্টমী- এইরূপ এক একটি উৎসব উপলক্ষে পাঁচজন ব্রাহ্মন পণ্ডিত, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, পোষ্যপরিজন, দীনদুঃখীকে আহ্বান করিয়া যথাসাধ্য সৎকারে আমার সুখের ভাগী করিতে চাহি। আমি যে একজন গৃহহীনকে আশ্রয় দিতে পারি, তৃষ্ণার্তের পিপাসা নিবারণ করিতে পারি, অবোলা জীবদের কিছুমাত্র সুখবিধান করিতে সমর্থ হই, আমার এ সৌভাগ্য যেন সকলের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহে। সাবিত্রী-ব্রত, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে সৎকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়, বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্যসুখ দিয়াছেন তাহা সকলের সহিত বন্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ। সেইজন্য আমাদের উৎসবে ভাবের প্রাধান্য-বাহিরের সামারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে। পতিব্রতা স্ত্রীর হাতের সামান্য লোহা ও মাথার সিন্দুর

যেমন আমাদের মনে একটি অনির্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সূচিত করিয়া দেয়, নেত্রঝলসানো অলংকাররাজি তাহা পারে না- প্রীতি-বিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গলঘট ও চ্যুতপল্লবগুচ্ছ সেইরূপ আমাদের অন্তরে একটি শিবসুন্দর ভাব সঞ্চারিত করিয়া তুলে, সহস্র তড়িতালোক ও বিলাস-উৎসব সে শুভ কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে না। বিলাসের মণিমুক্তা আমাদের বাহিরে ঐশ্বর্যের পরিচায়ক মাত্র, কিন্তু উৎসবের ধান্যদূর্বামুষ্টি, অন্তরের অকৃত্রিম শুভকামনার বাহ্য চিহ্ন। ইহার সহিত ধনীর রত্নভান্ডারের তুলনা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মতো ইহার মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুণ্ণ শুচিতা আছে- বাহ্যাড়ম্বর-বাহুল্যের তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

শব্দার্থ

অন্তপুর = ভিতর
পৈতার সুতা = মন্ত্রপূত সুতা, পবিত্র সুতা
প্রতিষ্ঠা = স্থাপন
অনির্বচনীয় = যা বলে বোঝানো যায়না
যথেষ্ট = ঢের
লঙ্ঘন = উপেক্ষা, অমান্য
গোষ্ঠাষ্টমী = গোপূজা
হৃদ্যতা = আত্মীয়তা

অনুশীলনী

১. আকলন

অ) ছক পূর্ণ করো :-

(১)

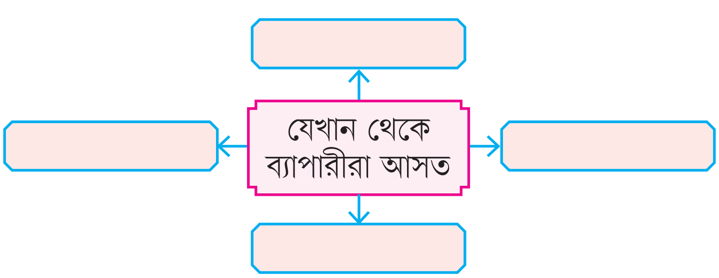

(২)

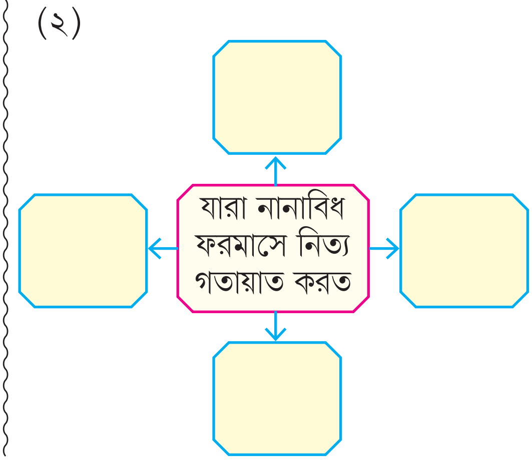

আ) কারণ লেখ :-

(১) উৎসবাঙ্গে, সকলেরই নিজ নিজ মর্যাদানুসারে স্থান নির্দিষ্ট ছিল...

(২) আমাদের উৎসবে ভাবের প্রাধান্য...

২. শব্দ সম্পদ

অ) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :-**

অনির্দিষ্ট, আবশ্যক, বৃহৎ, বিচ্ছেদ্য, উপভোগ, উন্মুক্ত, কল্যাণ, স্বীকার

আ) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমানার্থক শব্দ লেখ :-**

বিলম্ব, সহজ, প্রাঙ্গন, ক্ষুন্ন, সৎকার, সমর্থ, বাহ্য, অনুগ্রহ

ই) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির পদ পরিবর্তন কর :-**

গিন্নী, অংশ, অনুষ্ঠান, গ্রহণ, দান, সংগ্রহ, ভোজন, জীর্ণ, সুষ্ঠু

ঈ) **নিম্নলিখিত শব্দাগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো :-**

প্রত্যেক, একান্ন, গোষ্ঠাষ্টমী, অত্যন্ত, মাসেক

৩. অভিব্যক্তি

অ) ''উৎসব মানুষের মনে আনন্দ এনে দেয়''- এই বিষয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) 'ভারতবর্ষ' - বিবিধতার মধ্যে একতার অনুভব করে'- এই বিষয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করো।

৪. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) প্রাচীন কালের উৎসবের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

আ) বর্তমান কালের উৎসবের বৈশিষ্ট আলোচনা করো ।

ই) আমাদের উৎসবে কল্যাণী ইচ্ছার গুরুত্ব কতখানি এ বিষয়ে তুমি যা জানো লেখ।

ঈ) 'আমাদের উৎসবে অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা' - এ বিষয়ে আলোচনা করো।

উ) আমাদের উৎসব কখন শুভ হয় ?

ঊ) আগেকার দিনে সকলে উৎসবে কীভাবে যোগদান করত ?

৫. সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

অ) আমাদের উৎসবে কিসের প্রথম প্রতিষ্ঠা ?

আ) উৎসবের প্রাণ কী ?

ই) বেতনভুক্ত সামান্য দাস-দাসীদিগকেও কীসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা হইত ?

ঈ) আমাদের উৎসবে কিসের প্রাধান্য থাকে ?

উ) শালওয়ালা কী কী লইয়া আসিত ?

ঊ) কাবুলিওয়ালা কী গায়ে দিয়ে দ্বারদেশে দাঁড়াত ?

বিশেষ অধ্যয়ন হেতু লঘুকথা

ছোটগল্প কথাসাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা। বাংলা সাহিত্যে লঘুকথা বা ছোটগল্পের আবির্ভাব উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ছোটগল্প বলতে সাধারণত তাকেই বোঝায় যা আধঘন্টা থেকে এক বা দুঘন্টার মধ্যে এক নাগাড়ে পড়ে শেষ করা যায়। তবে আকারে ছোটো হলেই তাকে ছোটোগল্প বলা যাবে না । কারণ ছোটোগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে বিন্দুতে সিন্ধুর বিশালতা থাকতে হবে, অর্থাৎ অল্প কথায় অধিক ভাব ব্যক্ত করতে স্থান হবে। উপন্যাসের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য এখানেই। ছোটগল্পে উপন্যাসের বিস্তার থাকে না, থাকে ভাবের ব্যাপকতা। উপন্যাস পড়ে পাঠক পরিতৃপ্তি লাভ করে, কিন্তু ছোটগল্প থেকে পায় কোনো ভাবের ইঙ্গিত মাত্র। ছোটগল্পের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো : এর ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে বৃহতের ইঙ্গিত থাকবে, এর আরম্ভ ও উপসংহার হবে নাটকীয়, এর বিষয়বস্তু সাধারণত স্থান কাল ও ঘটনার ঐক্য মেনে চলবে, এতে মানব জীবনের কোনো একটি বিশেষ মুহূর্ত, ভাব বা চরিত্রের একটি বিশেষ দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেকোনো ধরনের বাহুল্য বর্জনের মাধ্যমে গল্পটি হয়ে উঠবে রসঘন, এতে থাকবে রূপক বা প্রতীকের মাধ্যমে অব্যক্ত কোনো বিষয়ের ইঙ্গিত ইত্যাদি। সর্বোপরি গল্প সমাপ্তির পরেও পাঠকের মধ্যে এর গুঞ্জরণ চলতে থাকবে। তাহলেই তা সার্থক ছোটগল্পে পরিণত হবে।

প্রকৃত অর্থে বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পকার হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রথমগল্প 'ভিখারিনী' ১৮৭৪ সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও 'দেনা-পাওনা' (১৮৯০) গল্পটিই প্রথম সার্থক ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছোটগল্পের যে সকল গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে তা বহু ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এ সকল গুণাগুণের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত ছোটোগল্প লিখিত হয়ে থাকে।

তবে ছোটোগল্পের শুরুটা হবে একটি আকস্মিক ঘটনা বা ঘটনার কথা দিয়ে যাতে পাঠক সহজেই পরবর্তী লেখাগুলোয় আকর্ষিত হতে পারেন। এটি যে শুধু ঘটনার কথা হতে হবে এমন কথা নেই, সেটি চরিত্র বর্ণনা, কাহিনীর পরিস্থিতি, সংঘাতময় কোনো কথা, সামগ্রিক কাহিনীর সংযোজন অথবা গল্পের থিমের বক্তব্য দিয়েও শুরু করা যেতে পারে যেখানে তা পাঠকের কাছে আকস্মিক বিস্ফোরণের মতো মনে হতে পারে এবং তিনি আগ্রহের সঙ্গে গল্প বা কাহিনীর পরবর্তী অংশে সহজে প্রবেশ করতে পারেন। গল্পে ঘটনা অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাঠক যেন পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়ে যান । এ ঘটনাগুলো হতে হয় আকর্ষণীয়, বাহুল্যমুক্ত, কাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট বা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সব ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটতে ঘটতে একটি পরিণতির দিকে অগ্রসরমান হতে থাকবে।

লেখক পরিচিতি

(১৯২৪-১৯৮৮) ছিলেন একজন প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি লেখক। কালকুট ও ভ্রমর তার ছদ্ম নাম। তার রচনায় রাজনৈতিক কর্মকান্ড, শ্রমজীবী মানুষের জীবন এবং যৌনতাসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সুনিপুন বর্ননা ফুটে উঠেছে। ১৯৮০ সালে তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এ কারণে তাঁকে ১৯৪৯-৫০ সালে জেলও খাটতে হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হল 'গঙ্গা, 'প্রজাপতি, 'দেখি নাই ফিরে।' ১২ ই মার্চ ১৯৮৮ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

সমরেশ বসু

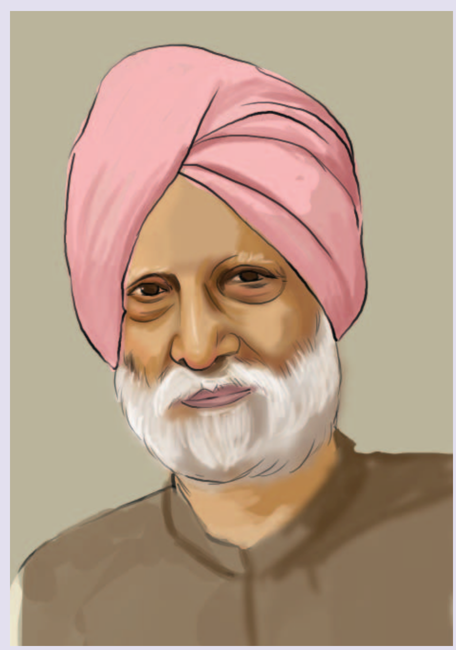

একজন বিখ্যাত ভারতীয় লেখক। তাঁর পান্ডিত্য ছিল পাঞ্জাবি, উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি সাহিত্যেও। এই সমস্ত ভাষায় তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কর্তার সিং দুগ্গাল জন্মগ্রহণ করেন বর্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাত্তয়ালপিন্ডি জেলার ধামালে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ। তার পিতার নাম জিয়ন সিং এবং মাতার নাম সতয়ন্ত কাউর। কর্তার সিং সম্মানের সঙ্গে লাহোরের খ্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে এম এ পাস করেন। কর্তার সিং অনেকগুলি ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক এবং নাটিকার স্রষ্টা ছিলেন। দুগ্গাল তার কর্মজীবন শুরু করেন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে কাজের মাধ্যমে। সেখানে তিনি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন। বহু পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন- 'পদ্মভূষণ', 'সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার'। পাঞ্জাব সরকার তাকে পাঞ্জাবি লেখক হিসেবে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছেন। এছাড়া আরও বহু পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। অবশেষে ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী কর্তার সিং দুগ্গাল পরলোক গমন করেন।

কর্তার সিং দুগ্গাল

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
(বনফুল)

সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম 'বনফুল'। বনফুল পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসক হয়েও তিনি সাহিত্য সাধনায় নিরলস মগ্ন থাকতেন। কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে ও আরও বহুবিধ রচনায় তার অসাধারণ সৃজনশীলতার পরিচয় রেখেছেন। তার রচনা সম্ভার বিশাল। তাঁর প্রকৃত নাম নয় ছদ্মনাম বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালি পাঠকের কাছে বেশি পরিচিত। বনফুলের জন্ম বিহারের অন্তর্গত পূর্নিয়া জেলার মতিহারী শহরে, ১৯শে জুলাই ১৮৯৯ সালে। পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। মাতা মৃণালিনী দেবী। বনফুল পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর পাঠ্যজীবন শুরু হয় মতিহারী স্কুলে । পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাস করেন। কয়েকশো ছোট গল্প লিখেছেন তিনি। তবে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, ঔপন্যাসিক হিসাবে। তৃনখন্ড তার প্রথম উপন্যাস। 'হাটে-বাজারে' উপন্যাসের জন্য পান রবীন্দ্র পুরস্কার। ভারত সরকার বন ফুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

আশপূর্ণা দেবীর জন্ম হয় ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ৮ ই জানুয়ারী। পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও মাতা সরলা সুন্দরী দেবী। হরেন্দ্রনাথ ছিলেন কমর্শিয়াল আর্টিস্ট। সরলা দেবীর সাহিত্য পাঠই ছিল তার জীবনের একমাত্র পরমার্থ। প্রথাগত-শিক্ষার সৌভাগ্য আশাপূর্ণার হয়নি ঠাকুরমার কঠোর অনুশাসনে। তার এই প্রতিকূল পরিবেশেও মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে দাদাদের পড়া শুনে শিখে নিয়েছিলেন পড়তে। আবার পিতামাতার সবচেয়ে বাধ্য হওয়ার জন্য তাঁদের সবচেয়ে প্রিয়পাত্রীও হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২৪ সালে, মাত্র ১৫ বছর ৮ মাস বয়সে কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা কালিদাস গুপ্তের সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়। আশাপুর্ণা দেবীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোট গল্প, পাতাচাঁপা, কামধেনু, শুনে পুণ্যবান, অভিনেত্রী, প্রভৃতি। মৃত্যু ১৩ ই জুলাই ১৯৯৫- খ্রিষ্টাব্দে।

আশাপূর্ণাদেবী

১৩ : অ) আদাব

- সমরেশ বসু

পাঠের মূলকথা

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা- হাঙ্গামা বেঁধেছিল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে। চরম বিপদে পড়েছিল মেহনতী দুটি মানুষ। তার একজন হিন্দু, আর অন্য জন মুসলমান। প্রথমে এরা প্রাণ ভয়ে একে অপরের পরিচয় দিতে চায়নি। ঘটনাক্রমে একে অপরের পরিচয় লাভ করে। ভিন্ন ধর্মের এই দুটি লোক ঐ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে একে অপরের মঙ্গল কামনা করেছে। তবে শহর থেকে বাড়ী যাওয়ার পথে দাঙ্গা হাঙ্গমার শিকার হয়েছিল মুসলমান নৌকার মাঝি লোকটি।

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল- চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।

লুঠেরা-রা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন। মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চিৎকার স্থানে স্থানে আবহাও-য়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী-গাড়ি। তারা গুলি ছুঁড়ছে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিনটা উলটে এসে পড়েছে গলি দুটোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙাচোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হল না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না।- 'আল্লাহু-আকবর' কি 'বন্দেমাতরম'।

হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত- পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে।- নিশ্চল নিস্তব্ধ চারিদিক।

বোধ হয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হল। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা... ওপাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি-একটি মাথা। মানুষ ! ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা-ধীর...। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনি চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল- হিন্দু না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয়তো মারাত্মক পরিণতিটা

দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে কথা জিজ্ঞাস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না -

ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দুজনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফেলে-হিন্দু না মুসলমান ? - আগে তুমি কও। অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে।... প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞাসা করে- বাড়ি কোনখানে ?

- বুড়িগঙ্গার হেইপারে - সুবইডায় । তোমার ?

- চাষাড়া- নারইণগঞ্জের কাছে।... কী কাম করো ?

- নাও আছে আমার, নায়ের মাঝি। - তুমি ?

- নারাইনগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষ্যে অন্ধকারের মধ্যে দুজনে দুজনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক- পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে। ... হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা শোরগোল ওঠে। শোনা যায় দুপক্ষেরই উন্মত্ত কন্ঠের ধ্বনি। সুতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

- ধারে - কাছেই য্যান লাগছে। সুতা-মজুরের কন্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল। হ চলো এই খান থেইক্যা উইঠ্যা যাই। মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কন্ঠে। সুতা-মজুর বাধা দিল। আরে না না - উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি ?

মাঝির মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোনো বদ অভিপ্রায় নেই তো। সুতা-মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিয়ে ছিল, চোখে পড়তেই বলল- বইয়ো। যেমুন বইয়া রইছ- সেই রকমই থাকো।

মাঝির মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল- ক্যান ?

- ক্যান ? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল-ক্যান কী, মরতে যাইবা নাকি তুমি ?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল। - যামু না কি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি ?

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল- তোমার মতলবডা তো ভালো মনে হইতেছে না। কোন জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমারে মারণের লেইগা ? - এইটা কেমুন কথা কও তুমি ? স্থান-কাল ভুলে রাগে-দু:খে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

- ভালো কথাই কইছি ভাই, বইয়ো মানুষের মন বোঝো না ? সুতা-মজুরের গলায় যেন কী ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হল শুনে।

- তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি ?

সোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব- মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো। অন্ধকারে গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের, ঘরের কথা, মা-বউ ছেলে-মেয়েদের কথা... তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে, না তারাই থাকবে বেঁচে... কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে-দোকানে এত হাসা-হাসি, কথা কওয়াকওয়ি-আবার মুহূর্ত পরেই মারা-

মারি, কাটাকাটি-একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে? কী অভিশপ্ত জাত ! সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিশ্বাস পড়ে ।

- বিড়ি খাইবা ? সুতা-মজুর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে । মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাস মতো দুএকবার টিপে কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে । সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ্য করেনি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটা গেছে সেঁতিয়ে । বার কয়েক খসখস শব্দের মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে উঠল। বারুদ-ঝরা কাঠিটা ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

- হালার ম্যাচবাতিও গেছে সেঁতাইয়া। - আর একটা কাঠি বের করল সে। মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এল সুতা-মজুরের পাশে।

- আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহিনি- আমার কাছে দেও। সুতা- মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দুএকবার খস-খস করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

- সোহান, আল্লা ! নেও নেও- ধরাও তাড়াতাড়ি।... ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সুতা-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

- তুমি... ?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দুজোড়া চোখে অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট করে উঠে দাঁড়াল। বলল- হ আমি মোছলমান। কী হইছে ?

সুতা-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল- কিছু হয় নাই, কিন্তু...

মাঝির বগলের পুঁটুলিটা দেখিয়ে বললো, ওইটার মধ্যে কী আছে? পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখান শাড়ি। কাইল আমাগো ঈদের পরব জানো ?

- আর কিছু নাই তো। - সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

- মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি ? বিশ্বাস না হয় দেখো। - পুঁটুলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতা-মজুরের দিকে।

- আরে না না ভাই, দেখুম আর কী । তবে দিন কালটা দেখছ তো। ? বিশ্বাস করন যায়- তুমিই কও?

- ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি একটা সুঁইও নাই।

পরানটা লইয়া অখন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়। সুতা-মজুর তার জামা-কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দুজনে বসল পাশাপাশি। বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনোযোগসহকারে দুজনে ধূমপান করল খানিকক্ষণ।

- আইচ্ছা... মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয় - বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে ।

- আইচ্ছা- আমারে কইতে পারনি - এই মাইর-দইর কাটা- কুটি কিয়ের লেইগা ?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্ণকন্ঠেই জবাব দিল সে- দোষ তো তোমাগো ওই লিগওয়ালোগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটূক্তি করে উঠল - হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারা মারি কইরা হইব কী। তোমাগো দুগা লোক মরব, আমাগো দুগা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব ?

- আর আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা - হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে।- তুমি মরবা আমি মরুম, আর আমাগো পোলা-মাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল-সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুম জারি কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই। মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি, নইলে এমুন কামড়াকামড়িটা লাগে কেম্‌বায়?- নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দুহাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।

- হ !

- আমাগো কথা ভাবে কেডা ? এই যে দাঙ্গা বাধল- অখন দানা জুটাইব কোন্ সুমুন্দি ! নাওটারে কি আর ফিরা পামু ? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে- তার ঠিক কি ? জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েবমশয় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান হজরতের হাত, বকশিশ দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে।

সুতা-মজুর কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দটা যেন বড়ো রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখাচোখি করে।

- কী করবো ? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটাকে বগলদাবা করে।

- চলো পলাই। কিন্তু যামু কোনদিকে ? শহরের রাস্তাঘাট তো ভালো চিনি না।

মাঝি বলল, চলো যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিশের মাইর খামু না, ওই ঢ্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

- হ। ঠিক কথাই কইছ। কোনদিকে যাইবা কও- আইয়া তো পড়ল।

- এই দিকে। -

গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করল মাঝি। বলল, চলো, কোনোগতিকে একবার যদি বাদামতলীর ঘাটে গিয়া উঠতে পারি- তাইলে আর ডর নাই।

মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবারে পাটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুটফুট করছে। দুইজনেই একবার থমকে দাঁড়াল- ঘাপটি মেরে নেই তো কেউ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এমোড় ওমোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে। খানিকটা এগিয়েছে এমন সময় তাদের পিছনে শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখলো- অনেকটা দুরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ-পাশে মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভলবার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনিতুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দুরে, উকি ঝুঁকি মারতে মারতে আবার তারা বেরুল।

- কিনারে কিনারে চলো। সুতা-মজুর বলে। রাস্তার ধার ঘেষে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

- খাড়াও। মাঝি চাপা-গলায় বলে। সুতা-মজুর চমকে থমকে দাঁড়ায়।

- কী হইল ?

- এদিকে আইয়ো- সুতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পানবিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

- হেদিকে দেখো।

মাঝি সংকেত মতো সামনের দিকে তাকিয়ে সুতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু বারান্দায় দশ-বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থাণূর মতো দাঁড়িয়ে আছে। আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কী যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাতমুখ নেড়ে। বারান্দার নিচে ঘোড়ার জিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলই পা ঠুকছে মাটিতে।

মাঝি বলে- ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি । আর একটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে হেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাট।

সুতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল। - তবে ? - তাই কইতাছি তুমি থাকো, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এইটা হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠ্যা বাড়িতে যাইবা গা।

- আর তুমি ?

আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে - আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কী হইল না হইল আল্লাই জানে। কোনোরকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

- আরে না না মিয়া কর কী ? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে- কেমনে যাইবা তুমি, আঁ? আবেগ উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

- ধইরো না, ভাই, ছাইড়া দেও। বোঝ না তুমি কাইল ঈদ, পোলামাইয়ারা সব আইজ চান্দ দেখেছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিনব বাপজানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই - পারুম না - মনটা কেমন করতাছে। মাঝির গলা ধরে আসে। সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে। কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।

- যদি তোমায় ধইরা ফেলায় ? ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

- পারব না ধরতে ডরাইও না। এইখান থাইকা য্যান উইঠো না। যাই... ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। - আদাব

- আমিও ভুলুম না ভাই - আদাব ।

মাঝি চলে গেল পা টিপে-টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুকধুকুনি তার কিছুতে বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, ভগমান - মাঝি য্যান বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ নিশ্বাসে। অনেকক্ষণ তো হল মাঝি বোধ হয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহা ‘পোলামাইয়ার’ কত আশা নতুন জামা পরবে আনন্দ করে পরবে। বেচারা ‘বাপজানের’ পরান তো। সুতা-মজুর একটা নিশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ ? - সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কী করবে ? মাঝি তখন-হল্ট...

ধক্ করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কী যেন বলাবলি করছে চিৎকার করে।

- ডাকু ভাগতা হ্যায়।

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম, গুড়ুম। দুটো নীলচে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আঙুল কামড়ে

ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ আর্তনাদ সে শুনতে পেয়েছে। সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলামাইয়ার তার বিবির জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে । মাঝি বলছে - পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।

শব্দার্থ

বীভৎস = ভয়ানক	নিষ্ফল = ফল হয়ে না যাতে	অধৈর্য = ধৈর্য না থাকা
আততায়ী = খুনী	নিস্তব্ধ = চুপচাপ	উদ্বেগে = দুশ্চিন্তায়
সুমুন্দি = শ্যালক, শালা	মতলবডা = উদ্দেশ্যটা	কোনোগতিকে = কোন ভাবে
সোরগোল = গন্ডগোল	বন্দুকধারী = বন্দুক ধারণ করে যে,	ন্যাতারা = নেতারা
ডাস্টবিন = নোংরা জিনিসপত্র রাখার পাত্র	অশ্বারোহী = ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেছে যে	

১৩ : আ) অলৌকিক

- কর্তার সিং দুগ্‌গাল

পাঠের মূলকথা

সদ্‌গুরু নানক তার শিষ্যদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে হাসান আব্দালের জঙ্গলে এসে পৌঁছোন। নানক হেঁটে চলেছেন, হঠাৎ তার এক শিষ্য মর্দানার জল পিপাসা পেল। গুরু নানক একটি অলৌকিক উপায়ে তার সেই জল পিপাসা দূর করলেন। অলৌকিক উপায়ে গুরু নানক পাহাড় থেকে নেমে আসা একটি বড় পাথরের চাঁই হাত দিয়ে থামিয়ে দিলেন। আরও একটি আশ্চর্য ঘটনা হলো পাঞ্জাসাহেবের উপর দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে যে ট্রেনটি যাচ্ছিল সেটিও একটি অলৌকিক উপায়ে থামানো হয়েছিল।

তারপর গুরু নানক ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলেন হাসান আব্দালের জঙ্গলে। ভয়ানক গরম পড়েছে। গনগনে রোদ চারিদিক সুনসান। পাথরের চাঁই, ধু ধু বালি, ঝলসে যাওয়া শুকনো গাছপালা। কোথাও একটা জনমানুষ নেই।

'তারপর কী হল মা ?' আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি।

'গুরু নানক আত্মমগ্ন হয়ে হেঁটে যাচ্ছেন হঠাৎ শিষ্য মর্দানার জলতেষ্টা পেল। কিন্তু কোথায় জল ? গুরু বললেন ভাই মর্দানা, সবুর করো। পরের গাঁয়ে গেলেই পাবে। কিন্তু তার কাকুতি- মিনতি শুনে গুরু নানক দুশ্চিন্তায় পড়লেন। অনেক দূর পর্যন্ত জল পাওয়া যাবে না অথচ সে বেঁকে বসলে সবাইকেই ঝক্কি পোয়াতে হবে। গুরু বোঝানোর চেষ্টা করলেন,

'দেখো মর্দানা, কোথাও জল নেই, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করো। এটাকে ভগবানের অভিপ্রায় বলেই মেনে নাও।' মর্দানা তবু নড়তে রাজি নয়। সেখানেই বসে পড়ে। এগুবার আর উপায় নেই। গুরু গভীর সমস্যায় পড়লেন মর্দানার একগুঁয়েমি দেখে হাসি পেলেও সেই সঙ্গে বিরক্তও হলেন। পরিস্থিতি দেখে ধ্যানে বসলেন তিনি। চোখ খুলে দেখেন, মর্দানা তেষ্টার চোটে জল ছাড়া মাছের মতো ছটফট করছে। সদগুরু তখন ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'ভাই মর্দানা, এখানে পাহাড়ের চুড়োয় বলী কান্ধারী নামে এক দরবেশ কুটির বেঁধে থাকেন। ওঁর কাছে জল পেতে পার। এ তল্লাটে ওঁর কুয়ো ছাড়া আর কোথাও জল নেই।'

"তারপর কী হল মা?" মর্দানা জল পেল কিনা জানবার আর তর সইছিল না।

"মর্দানা শুনেই ছুটে গেল। একে তেষ্টায় কাতর, তার উপর মাথায় গনগনে রোদ ঘেমে নেয়ে পাহাড়ে উঠছে। হাঁপাতে হাঁপাতে শেষ অবধি অনেক কষ্টে উঠতে পারল। বলী কান্ধারীকে সেলাম জানিয়ে জল চাইলে তিনি কুয়োর দিকে ইঙ্গিত করলেন। সে কুয়োর দিকে এগুলে হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগল ওর মনে। জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে আসছ? মর্দানা জানায়, আমি পির নানকের সঙ্গী। ঘুরতে ঘুরতে, এদিকে এসে পড়েছি। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে কিন্তু নীচে কোথাও জল নেই। নানকের নাম কানে যেতেই বলী রেগে গিয়ে তাকে সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দিলেন। নেমে সে নালিশ জানাল। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে গুরু হাসেন, 'মর্দানা তুমি আর একবার যাও। এবার নম্রভাবে বলবে, আমি নানক দরবেশের অনুচর।' তার ভয়ংকর তেষ্টা পেয়েছে অন্য কোথাও জল নেই। ক্ষোভে দুঃখে বিড়বিড় করতে করতে সে আবার গেল। কিন্তু বলী কান্ধারী 'আমি কাফেরের শিষ্যকে এক গণ্ডূষ জলও দেব না' বলে এবারও তাড়িয়ে দিলেন। মর্দানা এবার যখন ফিরল, তখন রীতিমতো করুণ অবস্থা। গলা শুকিয়ে ফেটে যাচ্ছে, দরদর করে ঘামছে। বেশিক্ষণ বাঁচবে কিনা সন্দেহ। গুরু নানক সব শুনে মর্দানাকে 'জয় নিরঙ্কার' বলে ওর কাছে আর একবার যেতে বললেন। আদেশ অমান্য করতে না পেরে সে ফের রওনা দিল। যা অবস্থা, হয়তো পথেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। তিন বারের বার চুড়োয় পৌঁছেই মর্দানা ওঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ ফকির এবারও কাকুতি মিনতি অগ্রাহ্য করলেন, ঐ নানক নিজেকে পির বলে জাহির করে অথচ চেলার জন্য সামান্য খাবার জলও জোগাড় করতে পারে না। বলী কান্ধারী যথেচ্ছ গালাগাল করলেন। মর্দানা নেমে এসে গুরু নানকের পায়ে প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল। পিঠে হাত বুলিয়ে, সাহস জুগিয়ে উনি তাকে সামনের পাথরটা তুলতে বলেন। পাথরটা তোলায় তলা থেকে জলের ঝরণা বেরিয়ে এল। নিমেষেই চারিদিকে থৈ থৈ ঠিক সেই সময় বলী কান্ধারীর জলের প্রয়োজন হয়েছে। দেখেন কুয়োয় একটুও জল নেই। উনি রীতিমত হতভম্ব। ওদিকে নিচে জলস্রোত দেখা দিয়েছে। বলী কান্ধারী দেখলেন, গুরু নানক দূরে বাবলাতলে অনুচর সহ বসে রয়েছেন। ক্ষিপ্ত হয়ে বলী পাথরের একখানা চাঙড় নীচে গড়িয়ে দেন। দৃশ্যটা দেখে মর্দানা চেঁচিয়ে উঠতেই গুরু নানক শান্ত স্বরে 'জয় নিরঙ্কার' ধ্বনি দিতে বলেন। কাছে আসতেই উনি হাত দিয়ে পাথরটা থামিয়ে দিলেন। হাসান আব্দালে এখন যার নাম 'পাঞ্জাসাহেব' গুরু নানকের হাতের ছাপ ওতে লেগে রয়েছে।

গল্পটা শুনতে বেশ ভালো লাগছিল। কিন্তু হাত দিয়ে পাথরের চাঙড় থামিয়ে দেবার ব্যাপারটা মেজাজ বিগড়ে দিল। এ কি আদৌ সম্ভব? একটা মানুষ কিভাবে পাথরের চাঙড় থামিয়ে দেবে? ওতে কিনা আজো হাতের ছাপ লেগে আছে। বিশ্বাস হয় না, 'মনে হয় কেউ খোদাই করেছে।', মা'র সঙ্গে তর্ক শুরু করি। পাথরের তলা থেকে জল বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতিতে জলের উৎস আবিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া চাঙড় হাত দিয়ে থামিয়ে দেওয়া কিছুতেই বিশ্বাস হল না। মুখের ভঙ্গিতে মনের ভাবটা ফুটে ওঠায় মা চুপ করে গেলেন।

'গড়িয়ে পড়া পাথর কী ভাবে থামবে ?' গল্পটা মনে পড়লেই হাসি পেত। গল্পটা বার কয়েক গুরুদ্বারাতেও শুনেছি। কিন্তু এই ব্যাপারটাতে সবসময় মাথা বাঁকিয়েছি। এটা অসম্ভব।

গল্পটা আমাদের স্কুলে শোনানো হল। পাথরের ব্যাপারটা নিয়ে মাস্টার-মশাইয়ের সঙ্গেও তর্ক করলাম। 'যারা পারে তাদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব না' বলে উনি আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন।

তবু বিশ্বাস হল না। পাথরের চাঙড় কেউ থামাতে পারে? আমার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা করত।

কিছুদিন পর শুনলাম, পাঞ্জাসাহেবে 'সাকা' হয়েছে। সেকালে ঘনঘন 'সাকা' হত। কোথাও 'সাকা' হলেই বুঝতে পারতাম, বাড়িতে অরন্ধন। রাতে মেঝেতে শুতে হবে। তবে সাকা আসলে কী, তখন জানতাম না।

আমাদের গাঁ থেকে পাঞ্জাসাহেব তেমন দূরে না। সাকার খবর পাওয়া মাত্র মা পাঞ্জাসাহেবের দিকে রওনা দিল। সঙ্গে আমি আর আমার ছোটোবোন। সারাটা পথ ধরে মা কেঁদেছিল। সাকার ব্যাপারটা কী, সারাক্ষণ ধরে তাই ভাবছি। পাঞ্জাসাহেবে পৌঁছে এক আশ্চর্য ঘটনার কথা জানতে পারি।

দূরের শহরের ফিরিঙ্গিরা নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর গুলি করেছে। আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই আছে মৃতদের মধ্যে। বাকিদের অন্য শহরের জেলে পাঠানো হচ্ছে। কয়েদিদের যদিও খিদে-তেষ্টায় সব মরার মতো অবস্থা, তাও হুকুম হয়েছে, তাদের ট্রেন যেন কোথাও না থামে। পাঞ্জাসাহেবের লোকজন খবরটা পেয়ে সবাই উত্তেজিত।

পাঞ্জাসাহেবেই গুরু নানক মর্দানার তেষ্টা মিটিয়েছিলেন। ঠিক হল, ট্রেনটা থামানো হবে। স্টেশন-মাস্টারের কাছে আবেদন জানানো হল। টেলিফোন, টেলিগ্রাম গেল। তবু ফিরিঙ্গিদের হুকুম, কিছুতেই ট্রেনটাকে থামানো যাবে না। এদিকে ট্রেনের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশ-প্রেমিকরা খিদেয় কাতর। জল রুটির ব্যবস্থা নেই। সেখানে ট্রেন থামানোর কোন ব্যবস্থা হয়নি। তবু লোকজন ট্রেন থামাতে বদ্ধপরিকর। শহরবাসিরা তাই স্টেশনে রুটি, পায়স, লুচি-ডাল ডাঁই করে রাখে।

কিন্তু ট্রেনটা ঝড়ের বেগে স্টেশন পেরিয়ে যাবে। কী করা যায় ? মায়ের বান্ধবী আমাদের সমস্ত ঘটনাটা শোনালেন, 'রেললাইনে আমার ছেলে পুলের বাবা ও তারপর ওঁর সঙ্গীরা শুয়ে পড়লেন। ওঁদের পেছনে এক-একজন করে আমরা বউ ও বাচ্চারা। তীক্ষ্ণ হুইসেল দিতে দিতে ট্রেন এল। গতি আগেই কমিয়েছে কিন্তু থামল অনেক দূরে এসে। দেখি ওর বুকের উপর দিয়ে চাকা, তারপর ওঁর সঙ্গীদের বুকের উপর দিয়ে আমি চোখ বুঁজলাম। চোখ খুলে দেখি ট্রেনটা একেবারে আমার মাথার কাছে এসে থেমেছে। পাশে শুয়ে থাকা সকলের মুখ থেকে জয় নিরঙ্কার ধ্বনি বেরুচ্ছে। ট্রেনটা পিছোতে লাগল, লাশগুলো কেটে দুমড়ে মুচড়ে গেল। স্বচক্ষে দেখেছি, খালপারের সেতুটির দিকে রক্তের স্রোত।

অবাক-বিহ্বল বসে আছি, মুখে কথা নেই। সারাদিন একফোঁটা জলও মুখে দিতে পারিনি।

সন্ধ্যায় ফেরার পথে মা ছোটবোনকে পাঞ্জাসাহেবের গল্প বলছিল। গুরু নানক মর্দানার সঙ্গে কীভাবে এ রাস্তায় এসেছিলেন। তেষ্টা পেলে গুরু নানক কোন পরিস্থিতিতে তাকে বলীকান্ধারীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বলী কান্ধারী কী ভাবে তিন-তিনবার মর্দানাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। গুরু নানক তাকে কখন পাথর তুলতে বলেন। কীভাবে মাটি

ফুঁড়ে ঝরনা বেরিয়ে আসে। তাতে বলী কান্ধারী ক্ষিপ্ত হয়ে পাথরের বড় চাঙড় গড়িয়ে দেয়। মর্দানা ঘাবড়ে গেলেও গুরু নানক 'জয় নিরঙ্কার' বলে কীভাবে হাত দিয়ে সেটা থামিয়ে দেন। শুনতে-শুনতে ছোটোবোন মাকে বাধা দিল, কিন্তু একটা মানুষ কীভাবে পাথরের এত বড় একটা চাঙড় থামাবে? অমনি আমি বলে উঠি', ঝড়ের বেগে ছুটে আসা ট্রেন থামানো গেল, পাথরের চাঁই থামানো যাবে না কেন ?' আমার চোখে জল।

কোনো কিছুর পরোয়া না করে, জীবন তুচ্ছ করে ট্রেন থামিয়ে যারা খিদে তেষ্টায় কাতর দেশবাসীকে রুটি জল পৌঁছে দিয়েছিল, চোখের জলটা তাদের জন্য।

শব্দার্থ

সুনসান = ফাঁকা, শূন্য
বিগড়ে = বিরূপ হয়ে
ঝক্কি = ঝামেলা
নিরস্ত্র = অস্ত্রহীন
তল্লাটে = অঞ্চলে
মুছড়ে = মোচড়দিয়ে
বিহ্বল = অচেতন প্রায়, অত্যন্ত অভিভূত
যথেচ্ছ = ইচ্ছেমতো, খুশিমতো
আত্মমগ্ন = নিজের কাজে রত
অগ্রাহ্য = গ্রাহ্য না করা
দরবেশ = মুসলমান সন্ন্যাসী, ফকির
বদ্ধ পরিকর = দৃঢ় সংকল্প
হতভম্ব = কিংকর্তব্যবিমূঢ়
কৌতূহল = উৎসুকতা
আদৌ = মোটেই
একগুঁয়েমি = একরোখা
কয়েদি = কারারুদ্ধ ব্যক্তি
পির = মুসলমান সাধু

১৩ : ই) শ্রীপতি সামন্ত

- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

পাঠের মূলকথা

ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা নেই এমন ভিড়। শ্রীপতি সামন্ত ট্রেনে করে মাল পত্র নিয়ে কলকাতায় যাবেন। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়ের জন্য শ্রীপতি সামন্ত গাড়ীতে চড়তে পারছিলেন না। তাই প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন চাকরদের জন্য বরাদ্দ কামরায় ওঠার জন্য অনুরোধ করেন তিনি।

কিন্তু সাহেবি পোশাকে প্রথম শ্রেণীর বাঙালি যাত্রী সামন্তকে প্রথম শ্রেণী সংলগ্ন চাকরদের জন্য বরাদ্দ কামরায় উঠতে দিতে নারাজ ছিল তবুও সামন্ত মশায় সেই কামারায় উঠে পড়েন। সামন্ত মশায় পিতার কীর্তিমান পুত্র।

ট্রেনে অসম্ভব ভিড়।

তিলধারণের স্থান হয়তো আছে, মনুষ্যধারণের সত্যই স্থানাভাব। তৃতীয় শ্রেনিতে লোক ঝুলিতেছে। মধ্যম শ্রেণিতে গাদাগাদি, এমনকি দ্বিতীয় শ্রেণিরও সমস্ত বার্থগুলি অধিকৃত। কেবল প্রথম শ্রেণীটি খালি বলা চলে। সেখানেও সাহেবি - পোশাক পরিহিত একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।

একটি স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে।

রাত্রি আটটা হইবে।

শ্রীপতি সামন্ত সমস্ত প্ল্যাটফর্মময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন, কোথাও উঠিতে পর্যন্ত পারিলেন না। অথচ তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, ঘুমাইয়া যাইবেন। টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর।

সকলে নেপোলিয়ান নহেন। সামন্ত মহাশয় তো নহেনই। সুতরাং তাঁহার দ্বারা এ অসম্ভব সম্ভব হইল না। বার কয়েক ছুটাছুটি করিয়া অদ্য এই ট্রেনযোগে তৃতীয় শ্রেণীতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কলিকাতা যাওয়ার আশা সামন্ত মহাশয়কে অবশেষে ছাড়িতে হইল।

কিন্তু অদ্য তাঁহার নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন।

বিগত তিন রাত্রি মোটে ঘুম হয় নই।

সর্বেশ্বরবাবুর নাতনিটির বিবাহের গোলমালে দুই রাত্রি তিনি চোখে-পাতায় করিতে পারেন নাই।

কাল তো অসহ্য গরম গিয়াছে।

লোক পাখা নাড়িবে, না, ঘুমাইবে।

স্খলমান চশমাটা সামলাইয়া সামন্ত মহাশয় সহসা কুলিটাকে বলিলেন - 'ওরে দাঁড়া।'

শ্রীপতী সামন্ত নেপোলিয়ান নহেন, তাহা ঠিক কিন্তু তিনি স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের কীর্তিমান পুত্র - যে ছিদাম সামন্তের প্রতিভার গুণগান এখনও ছেলে-বুড়ো সকলে করিয়া থাকে।

শ্রীপতি সামন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

বিদ্যুৎচমকের মতো একটি বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

গার্ডের সহিত কথোপকথন-নিরত কাপড় টুপি-পরিহিত ছোটোবাবুর নিকট হাত কচলাইতে কচলাইতে সামন্ত মহাশয় বলিলেন -

'ট্রেনে তো আজ্ঞে চড়াই দায়, হুজুর। যদি অনুমতি করেন, এই এক পাশটায় আমি চড়ে পড়ি-'

বলিয়া সামন্ত মহাশয় প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন ভৃত্যের কামরাটির দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

স্টেশনের ছোটোবাবুটি এই নিতান্ত ভারতীয় বৃদ্ধের স্পর্ধায় প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পান্বিত হইলেন। ভাবিলেন মূর্খলোক হয়তো বুঝিতে পারে নাই - তাই।

বলিলেন - 'ওটা যে ফাস্‌টো কেলাস গো -'

'ফাস্‌টো কেলাস' চেনেন না এতটা মূর্খ অবশ্য সামন্ত মহাশয় নহেন।

তিনি বিনীতভাবে আবার বলিলেন - 'আজ্ঞে, ওটাতে নয়, এইটের কথা আমি বলছি। এটাতে তো গদিমদি কিছুই নাই। যদি হুজুর দয়া করেন-আমি বুড়ো মানুষ- গরিব লোক - আমার শরীরটাও খারাপ - বিশ্বাস করুন, হুজুর, তিন রাত্তির ঘুম হয় নাই-'

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের একপ্রান্ত হইতে একটি ধূমায়মান পাইপ ঝুলিতেছিল।

সামন্ত-ছোটোবাবু-সংবাদ তিনি উপভোগ করিতেছিলেন।

সামন্ত মহাশয়ের বাহ্যদৃশ্য অবশ্য, মনোহর নহে।

পরনে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত একজোড়া দিশি মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাচ-ফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডান দিকের ডান্ডাটা নাই, সেদিকে সুতা বাঁধা।

সামন্ত মহাশয়ের ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা, চক্ষু দুইটি রক্তাভ, চোখের পাতা নাই। চোখ দুইটি দেখিলে কিন্তু লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। লোলচর্ম নির্লোভ মুখখানি বিনয়-গদগদ। মাথায় টাক। বর্ণ নাতিফরসা কালো। হাতে থেলো হুঁকা।

ছোটোবাবু বলিলেন - ''এই সায়েবকে বলো। ওঁরই চাকরের জন্য ও কামরাটা আলাদা করা আছে। উনি যদি আপত্তি না করেন, আমার আর আপত্তি কী-

‘‘প্রথম শ্রেণীর যাত্রিটি সাহেবি-পোশাক পরিহিত হইলেও বাঙালী। কিন্তু মাথা নাড়িয়া পাইপ চিবাইয়া তিনি উত্তর দিলেন-

‘‘দ্যাট কান্‌ট বি । আই কান্‌ট অ্যালাউ ।’’

সামন্ত মহাশয় করজোড়ে বলিলেন- ‘‘আমিও তো হুজুরের চাকরই- চাকর ছাড়া আর কি, অনুমতি যদি করেন দয়া করে-’’

এই বৃদ্ধের সহিত বাগবিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিতে সাহেবের আর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি স-পাইপ মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইয়া ইলেকট্রিক পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলিয়া দিলেন। ঢং ঢং করিয়া গাড়ি ছাড়িবার প্রথম ঘন্টা হইল।

সামন্ত মহাশয় অসহায়ভাবে আর একবার তৃতীয় শ্রেণিগুলির দিকে চাহিলেন।

পায়দানে পর্যন্ত লোক ঝুলিতেছে।

উহারই মধ্যে শেষে ঢুকিতে হইবে ।

অথচ- সামন্ত মতি-স্থির করিয়া ফেলিলেন।

‘‘শুনলেন হুজুর এইটাতেই চড়লাম আমি। ‘কুরু’কে পাঠিয়ে দেন-ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওরে, আন আন - এইটাতেই আন সব- ওহে কালীকিংকর - শ্যামাপদ কোথায়- বাঞ্ছা ও বাঞ্ছা- এই দিকে - এইখানেই চড়াও সব-’’

হই হই শব্দে কালীকিংকর, শ্যামাপদ, বাঞ্ছা কয়েক বোঝা শালপাতা, এক বান্ডিল খালি বস্তা, দুই হাঁড়ি গুড়, একটি তরমুজ, একটা বঁটি, একটা ছিপ, দুইটা প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোটো- বড়ো বোঁচকা ও পুঁটুলি এবং এক টিন ঘি সমেত সামন্ত মহাশয়কে ফার্স্ট ক্লাসেই তুলিয়া দিল। কালীকিংকর ও শ্যামাপদ পদধূলি লইয়া নামিয়া গেল।

সামন্ত মহাশয় হাসিয়া বাঞ্ছাকে বলিলেন- ‘‘তুই তা হলে ওই পাশের কামরায় থাক গিয়ে। তোরই মজা হল রে তামাক - টিকে সব গুছিয়ে রাখ।’’

বাঞ্ছা নামিয়া পাশের কামরায় চড়িল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

থেলো হুকাটায় একটা টান দিয়া ঘড়ঘড়ায়মান কফটাকে সশব্দে বহিরে নিক্ষেপ করিয়া সামন্ত মহাশয় সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- ‘‘ঘুমটা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, হুজুর। কাল সকালে মাথাটা ঠিক রাখা দরকার - অনেক টাকার কেনা- বেচা করতে হবে।’’

যথাসময়ে গুম্ফশ্মশ্রু-সমন্বিত পাঞ্জাবি ক্রু আসিয়া দর্শন দিলেন ও ভাড়া চাহিলেন।

সামন্ত মহাশয় বেঞ্চির উপর উবু হইয়া ক্রু’র দিকে ঈষৎ পিছু ফিরিয়া বসিয়া কোমর হইতে এক সুদীর্ঘ গেঁজে বাহির করিয়া বেঞ্চির উপর সেটি উজাড় করিয়া ঢালিলেন এবং ক্রু’র নির্দেশমতো নিজের যাবতীয় জিনিসপত্রের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া স-রসিদ গেঁজেটি পুনরায় কটিবদ্ধ করিলেন।

যদি কেহ গণিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত, সামন্ত মহাশয়ের গেঁজেতে খুচরা টাকা ছাড়া দশ হাজার টাকার নোটই রহিয়াছে। তাহার পর পাঞ্জাবি ক্রু বাঙালি সাহেবটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন-

‘‘ইওর টিকেট প্লিজ।’’

‘‘মাই টিকিট ইজ ইন মাই স্যুটকেস। প্লিজ টেক মাই ওয়র্াড ফর ইট।’’

‘‘আই কান্ট পাঞ্চ ইওর ওয়ার্ড? মাই ডিউটি ইজ টু পাঞ্চ টিকেটস।’’

অবশেষে দেখা গেল, বাঙালী সাহেবটির নিকট দিয়াশলাই, পাইপটি ও একটি সিনেমা সাপ্তাহিক ছাড়া আর কিছুই নাই।

বচসা বাধিল।

বিশুদ্ধ ইংরাজিতে বেশিক্ষণ বচসা চালান শক্ত।

সুতরাং উভয়েই রাষ্ট্রভাষা হিন্দির শরণাপন্ন হইলেন।

সামন্ত মহাশয়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল- ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

এ আবার কী ফ্যাসাদ উপস্থিত হইল ! ঘুমাইতে আর দিবে না দেখিতেছি ! ভগবান বিরূপ হইলে কাহার বাবার সাধ্য ঘুমায় ।

দুর্গা-শ্রীহরি-

সামন্ত মহাশয় সশব্দে বিজৃম্ভন করিলেন ।

সহসা সামন্ত মহাশয়ের কানে গেল 'কুরু' যেন সাহেবটিকে বলিতেছে যে, বাঙালী বাবুদের সে ভালো করিয়াই চেনে, সুতরাং-সামন্ত মহাশয়ের চুলহীন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল ।

তিনি আবার উবু হইয়া বসিয়া কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিলেন । ও কুরু মহাশয়- বাজে কথার কচকচিতে আর কাজ কি ! কটা টাকা লাগবে বলুন, আমিই দিয়ে দি- ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন-'' সাহেব ও ক্রু উভয়ে বিস্মিত হইলেন । বলে কী ।

সামন্ত মহাশয় কিন্তু সমস্ত ভাড়াটা মিটাইয়া দিলেন এবং সাহেবকে বলিলেন - 'আপনিও তো হুজুর কলকাতা যাচ্ছেন । আমার গদিতে টাকাটা জমা দেবেন সুবিধামতো ।'

এই বলিয়া তিনি একটা ঠিকানা দিলেন ।

তাহার পর ক্রু'র দিকে ফিরিয়া মাথা ঝাঁকিয়া সামন্ত মহাশয় রাষ্ট্রভাষায় বলিলেন - ''কটা বাঙালী আপ দ্যাখা হ্যায় ? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতা- রে বাপু । দুর্গা-শ্রীহরি । দুর্গা-শ্রীহরি । দুর্গা-শ্রীহরি ।''

সামন্ত মহাশয় আবার বেঞ্চে লম্বমান হইলেন ।

বাঙালী সাহেবটি সামন্ত মহাশয়ের গদিতে টাকাটা ফেরত দিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু সমস্ত পথটা তিনি আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না ।

শব্দার্থ

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা = সংকল্প পালনে শক্তমনোভাব
স্খলমান = খসে পড়ছে এমন
স্বর্গীয় = পরলোকগত
কীর্তিমান = যশস্বী
একপ্রান্ত = একপাশ
ঈষৎ = অল্প
আপত্তি = বাধা
করজোড় = হাতজোড়
বচসা = ঝগড়া
বাহ্যদৃশ্য = বাইরের ছবি
নির্লোম = লোমহীন
গুম্ফশ্মশ্রু সমন্বিত = গোঁফদাড়িওয়ালা
কটিবন্ধ = কোমরে বাঁধা
প্রকান্ড = বড়
প্রায়োজন = দরকার
মজা = আনন্দ
নিক্ষেপ = ছুড়ে ফেলা
বিজৃম্ভন = হাইতোলা

১৩ : ঈ) প্রতিশ্রুতি

- আশাপূর্ণা দেবী

পাঠের মূলকথা

এই পাঠের মূল চরিত্র সত্যবতী একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলন। সমাজের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ হল তার মেয়ে সুবর্ণের বিয়ে যেন কম বয়সে না দেন, ১৫ বছর বয়স পূর্ণ হলেই তবে যেন বিয়ে হয় এবং দ্বিতীয় হলো বধু নির্যাতনের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ করা। সত্য একজন নির্ভীক, সৎ ও সমাজ সেবিকা ছিলেন। কারও প্রতি কোন অন্যায় অবিচার তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এখানে তাকে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে তবু ও তিনি পিছিয়ে আসেন নি। নিজের ছেলেকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। তাঁর স্বামী তাঁর অনুগত ছিলেন এজন্য তার স্বামীকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছে।

নিতাইয়েয় বাড়ি থেকে চলে এসেছিল সত্য, ‘‘মাথার মধ্যে যাতনা হচ্ছে’’ বলে, কিন্তু সেই যাতনা থেকে যে এমন জোর জ্বর হবে, সে কথা কে জানত?

সত্য নিজেও যখন শুয়ে পড়েছিল, তখন বুঝতে পারেনি। উঠল না, রান্না করল না দেখে সরল এসে আস্তে কপালে হাত দিয়ে দেখল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। আর কী যেন বলছে বিড় বিড় করে।

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল বেচারার, বাবাকে ডাকল।

কিন্তু বাবাই বড়ো ভরসাদার !

‘‘সে তো বিপদ দেখলেই মেয়েমানুষের মতো কপালে করাঘাত করে। ডুকরে উঠে বলল, ‘‘ছুটে গিয়ে পিসিকে ডেকে আন্।’’

সদু এসে মাথায় জলপটি, পায়ে গরমজলে গামছা ভিজিয়ে সেঁক ইত্যাদি প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। এদের জন্য দুটো ভাতে-ভাতও ফুটিয়ে দিয়ে খাইয়ে- দাইয়ে বিদায় নিল অনেক রাতে।

না, রাত্রে থাকল না।

সতীনের ছোট ছেলেটা নাকি বড়মা-কে নইলে ঘুমোয় না। আর মুখুজ্জে মশাইয়ের ও রাতে দশবার তামাক লাগে।

তবে আশ্বাস দিয়ে গেল সদু, ভোরেই আবার আসবে।

তখন সত্য অজ্ঞান অচৈতন্য।

নবকুমার মাথায় বাতাস দিচ্ছে।

অনেক রাত্রে হঠাৎ সত্য চোখ তাকিয়ে বলে উঠল, ‘‘শোনো কাছে এসো, আমার গাটা ছোঁও।’’

শিউরে উঠল নবকুমার, কী এ? প্রলাপের ঘোর? না আসন্ন মৃত্যুর আভাস?

‘‘ছোঁও, গা ছোঁও।’’

নবকুমার ভয়ে ভয়ে গায়ে একটু হাত ঠেকালো।

সত্য উত্তেজিত স্বরে বলল, ‘‘গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করলে কী হয় জান, তো ?... মনে রেখো, শোনো - আমি যদি মরে যাই সুবর্ণকে তুমি সাত-সকালে বিয়ে দেবে না!... বলো, বলো দিব্যি করো।’’

রোগীর প্রলাপ !

এতে সায় না দিলে প্রকোপ বাড়বে। নবকুমার তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ‘‘হ্যাঁ হ্যাঁ করছি।’’ ‘‘বলো, মুখে বলো, ষোলো বছর বয়েস না হলে বিয়ে দেবে না সুবর্ণর?’’

ষোলো।

মেয়ের বয়েস !

ষোলো বছর পর্যন্ত আইবুড়ো রেখে দেবে!

নবকুমার ভাবল, হঠাৎ এত বড়ো জ্বর কেন হল সত্যর যে এতখানি ভুল বকা শুরু করেছে !

কিন্তু কারণ যাই হোক, ঠান্ডা রাখতে হবে।

নবকুমার ব্যস্ত সুরে বলে ''আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।''

''তাই হবে বললে হবে না।'' সত্য প্রায় তেড়ে উঠে বসে, ''নিজে মুখে বলো, ষোলো বছরের আগে সুবর্ণর বিয়ে দেব না।''

পাগলের সঙ্গে চাতুরীতে দোষ কী?

আর প্রলাপের রুগির সঙ্গে পাগলের প্রভেদই বা কী ? টুক করে সত্যের গা থেকে হাতের স্পর্শটুকু তুলে নিয়ে নবকুমার বলে ওঠে, ''এই তো বলছি, তোমার ইচ্ছে ব্যতীত বিয়ে দেব না সুবর্ণর।''

''আসল কথাটাই বললে না তুমি।'' সত্য চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ''আসল কথায় ফাঁকি দিয়ো না। সুবর্ণকে মেরে ফেলো না। ওকে বাঁচাতে হবে, হাজার হাজার সুবর্ণকে বাঁচাতে হবে।''

ধপ করে শুয়ে পড়ে সত্য।

নবকুমার পাখাটা আরও জোরে জোরে নাড়তে থাকে। হাজার হাজার সুবর্ণ ! ভগবান এ যে ঘোর বিকার !

ভগবান এ কী করলে তুমি !

হে মা কালী, রাতটা পোহাতে দাও, আমি নিজে গিয়ে খাঁড়া-ধোয়া জল এনে খাইয়ে দেব।

দেশের কালীর কাছেও মানত করে বসে নবকুমার। আবার হরির লুটও মানে। কী করবে?...

নবকুমার যে শুনেছে বিকারের রক্ত মাথায় চড়লে, ভুল বকতে বকতে আর মাথা চালতে চালতে মরে যায় মানুষ!... লক্ষণ তো দেখাই দিয়েছে, রাত্তিরের মধ্যে যদি জ্বর না কমে, সেই পরিণতিই তো অনিবার্য।

মা কালীর দয়াই বলতে হবে।

খাঁড়া-ধোয়া জল না খেয়েই জ্বর কমে গেল।

শেষ রাত্তিরের দিকেই কমে গেল। ঘামের তোড়ে বিছানার চাদর সপ্‌সপিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে জ্বর প্রায় বিদায় নিলই বলা যায়।

কিন্তু ঠান্ডা গায়ের রক্ত, পাঁচদিন জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরের রক্ত, 'বিকারের' তীব্রতা পেল কী করে ? বিকারের বেগ। সেই তীব্রতার বেগ বিকারের বিকৃতি নিয়েই তো মাথায় চড়ে উঠল। নইলে ত্রিভুবনে কে কবে এমন তাও শুনেছে?

কোনো বাঙালী মেয়ের, গেরস্থ ঘরের মেয়ের পক্ষে কখনও সম্ভব এমন ভয়ানক কান্ড করা?

সত্যর চির অনুগত এবং সমর্থক ছেলেরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেল মায়ের এই ধারনাতীত দু:সাহসে।

খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সদুকে আর তার বরকে ডেকে আনল সাধন, তথাপি নবকুমার ব্যাকুল হয়ে সরলকে বলে বসল, ''বিপদে পড়লে চক্ষুলজ্জা করতে নেই, শাস্ত্রের নির্দেশ, তুই যা বাবা, একবার মাস্টার মশাইকে ডেকে নিয়ে আয়।''

'মাস্টার মশাইকে !'

সরল হাঁ হয়ে রইল।

বাবা ডাকতে বলছেন তাঁর মাস্টারমশাইকে। যার নাম করেন না, মুখ দেখেন না, সুহাসদি পর্যন্ত যার জন্য চিরকালের মতো পর হয়ে গেছে।

নবকুমার লজ্জাকে চাপা দেয় ব্যস্ততা দিয়ে।... হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি তো তাই। বললাম না বিপদের সময় চক্ষুলজ্জা শাস্ত্রের বারণ। তুই আমার নাম করেই ডেকে আন্। বলগে ভয়ানক গুরুতর কান্ড, পুলিশ এসেছে, বোধ হয় তোদের মার হাতে দড়ি পড়বে, এ শুনলে আর-''

দড়িটা মার হাতে পড়বে কেন, বিপদের সময় চক্ষুলজ্জার নিষেধটা কোন শাস্ত্রে আছে সে প্রশ্ন করে না সরল, ফতুয়াটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায় রান্না

ঘরের পিছনের দিকের দরজাটা দিয়ে।

এই দোরটা ছিল তাই রক্ষে।

নইলে সদর চেপে তো বসেছে বাঘা এক সাহেব পুলিশ।... কম্পিত কলেবরে নবকুমারের এগিয়ে দেওয়া চেয়ারখানায় বসে, সত্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

হ্যাঁ সত্যকেই প্রশ্ন করছে।

ছোটোখাটো ইংরেজী-মিশেল হাস্যকর উচ্চারণ-সমৃদ্ধ বাংলায়। আর পাথর-বাঁধানো-বুক সত্য সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে ঠায় দাঁড়িয়ে।

সাহেব পুলিশের নামে ডাকাবুকো মুখুজ্জে মশাই ও প্রথমে আসতে চাননি, কিন্তু সদুর একান্ত ব্যাকুলতায় আসতে বাধ্য হয়েছেন। হয়েছেন বটে, তবে সদরমুখো হননি, পৈতে হাতে ধরে দুর্গানাম জপ করতে করতে সদুর পিছু পিছু সেই পিছন দরজা দিয়ে ঢোকা মাত্রই সুবর্ণ কেঁদে ওঠে, সদুর হাঁটু জড়িয়ে ধরে বলে, "পিসি, মাকে ধরে নিয়ে যেতে গোরা এসেছে।"

"বালাই ষাট, দুগ্‌গা দুগ্‌গা, ধরে নেবে কেন?"

বলে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে সদু ফিসফিসিয়ে বলে, 'ঘটনাটা কিরে তুড়ু ? হল কী?"

সাধন শুকনো মুখে যা বিবৃতি দেয়, তার সার অর্থ এই, সত্যবতী কারুর সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে, কারুকে না জানিয়ে পুলিশ সাহেবের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল, কারুর জবানিতে পর্যন্ত নয়, নিজের নামে। সেই চিঠির সূত্রে "এনকোয়ারিতে" এসেছে পুলিশ।

চিঠির কারণ ?

কারণ অদ্ভুত। কারণ অভাবনীয়।

নিতাইয়ের বউ ভাবিনীর বোনের শোচনীয় অকাল মৃত্যুই নাকি কারণ।

মেয়েটাকে তার স্বামী আর শাশুড়ীতে মিলে কী রকম নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করে দৃপ্ত আবেদন জানিয়েছে সত্যবতী, এই দানবীয় অত্যাচারের সুবিচার হোক, সেই খুনি যুগলের উচিত মতো শাস্তি হোক।... তা যদি না হয়, বৃথাই তাঁদের ধর্মাধিকরণের- নাম করে আদালত খুলে বসে থাকা।...

আসামীদের নাম ধাম ঠিকানা সবই জানিয়েছেন সত্যবতী সেই আবেদন পত্রে।

সব শুনে সদু নিশ্বাস ফেলে বলে, "সেদিনের সেই বিকারেরই ঝোঁক এসব তুড়ু, দেহের রক্ত মাথায় চড়ে উঠেছিল জ্বরের ধমকে, সেই চড়া রক্তই বুদ্ধিসুদ্ধি বিগড়ে দিয়েছে। নচেৎ বাঙালি গেরস্থঘরের - মেয়ের পক্ষে এ কাজ সম্ভব? আমি তোকে নির্ঘাত বলছি তুড়ু, তোর ওই মা একদিন মাথার শির ছিঁড়ে 'সন্নেস রোগ' হয়ে মরবে। চিরদিনই মেয়েমানুষের আধারে ও একটা দস্যি পুরুষমানুষ ! তাই এই দুরন্ত রোগ।

সাধন আরও শুকনো মুখে বলে, "রোগই বলব, তা ছাড়া আর কী! চিরদিন এই এক রোগ, কোথায় কোন্‌খানে কে কী অন্যায় করল, যেন মা'র ওপরই করেছে। সকলের জ্বালা যন্ত্রনা নিজের ঘাড়ে নিয়ে কেবল কষ্ট পাওয়া রোগ। বাড়ির বাসনমাজা ঝি-টা একদিন তার ছেলেকে 'মরে যা' বলে গাল দিয়েছিল বলে মা তাকে তক্ষুনি ছাড়িয়ে দিলেন।"

"ছিষ্টিছাড়া, সবই ছিষ্টিছাড়া, চিরকেলে ছিষ্টিছাড়া। আশ্চর্যি ! ভগবান রূপ গুণ সবই দিয়েছিল, কিন্তু সার্থক করতে পারল না। এখন আবার নাকি শুনছি সেদিন জ্বরের ঘোরে তোর বাপকে দিব্যি গালিয়েছে পনের বছর বয়েস না হলে সুবর্ণর বিয়ে দেওয়া চলবে না।"

দিব্যিটা অবশ্য নিতান্তই হাস্যকর, অতএব ও নিয়ে মাথা ঘামায় না সাধন। প্রলাপের ঘোরে কী না বলে মানুষ।... তবে ওরও মনে হয়, বাস্তবিকই মাকে মা'র বিধাতা অনেক বুদ্ধিসুদ্ধি দিয়েছেন, শুধু জেদটা যদি ঈষৎ কম দিতেন !

‘‘আপনি একটু ওদিকে যাবেন পিসেমশাই।’’ সাধনের এই প্রশ্নে মুখুজ্জে মশাই বিচলিত স্বরে বললেন, ‘‘আমি বুড়োমানুষ । এইমাত্র স্নান সেরেছি, এখনও আহ্নিক হয় নি। এখন ওই ম্লেচ্ছ স্পর্শে-’’

‘‘না না... ছোঁবেন কেন ? এমনি-’’

‘‘এই দেখো পাগল ছেলের কথা। বাক্যবিনিময় মানেই তো ছোঁয়া। বাক্যের দ্বারা স্পর্শ, সেও বড়ো কম নয়। তাছাড়া তোমরা কলেজে পড়েছ, ইংলিশ শিখেছ- ’’

শিখেছ !

শিখেছে সেটা সাত্যি কথা।

কিন্তু এ তো লেখাপড়ার কথা নয়। সাহেব মাস্টার নয়। এ হল বিশ্রী একটা গোলমেলে ব্যাপার। এক্ষেত্রে প্রবীণ লোকই ভালো।

কিন্তু প্রবীণ লোক দ্বিতীয়বার স্নানের ভয়ে গেলেন না। শুধু উঁকিঝুকি মেরে দেখতে লাগলেন সত্য কিভাবে সাহেবের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে।

হ্যাঁ, তখন সত্যই বলছে, ‘‘বলো, তবে কী জন্য আদালত খুলে বসে আছ তোমরা ? সতীদাহ করে মেয়েমানুষগুলোকে পুড়িয়ে মারত আমাদের দেশ, তোমরাই সে পাপ থেকে উদ্ধার করেছ আমাদের। তবু এখনও কিছুই হয়নি। এখনও অনেক অনেক পাপ জমানো আছে। চার যুগ ধরে জমেছে এই পাপের বোঝা। এই পাপ দূর করতে পারো, তবেই বলি শাসনকর্তা সেজে বসে থাকা শোভা পাচ্ছে।... নচেৎ পরের দেশে এসে রাজাগিরি কীসের ? জাহাজ বোঝাই হয়ে ফিরে যাও না ?

‘‘মা !’’

সাধন এগিয়ে যায় মাকে নিবৃত্ত করতে। দেখছিল ‘বাংলা-নবিশ’ সাহেব তার মার এই ওজস্বিনী বক্তৃতার সামনে পড়ে সমস্ত বাংলা জ্ঞান হারিয়ে, ‘‘হোয়াট ? হোয়াট ?’’ করছে।

এই বক্তৃতার স্রোতে দোভাষীর কাজ করতে এলে, তার এফ এ. পড়া বিদ্যে স্থলকূল পাবে, এ ভরসা হল না। তাই ‘‘মা’’ বলে ডেকে নিবৃত্ত করতে চাইল।

কিন্তু সত্য বুঝি তখন সত্যিই পরিবেশ-পরিস্থিতির জ্ঞান হারিয়েছে, তাই ছেলের এই ডাকের ইশারায় কর্নপাত না করে বলতেই থাকে, ‘‘তোমার দেশে তো শুনি মেয়েমানুষের অনেক মান সম্মান সেই চোখ খুলে দেখতে পাও না এই হতভাগা দেশে মেয়েমানুষকে কী অপমানের মধ্যে, কী লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলে রেখেছে ? আইন করে বন্ধ করতে পার না এসব ? নিত্যি নিত্যি অনেক আইন তো বার করছ।’’

‘‘বড়ো বউ।’’

নবকুমার আর থাকতে পারে না, চেঁচিয়ে ডেকে ওঠে, আর ঠিক এই সময় ভবতোষ মাস্টার এসে দাঁড়ান সরলের সঙ্গে সঙ্গে।

ঢুকবার মুখে বোধ করি সত্যর এই তীব্র ভাষা তাঁর কানে ঢুকছে। তাই সত্যকেই উদ্দেশ্য করে শান্ত স্বরে বলেন, ‘‘ভিনদেশের লোক এসে আইন করে এদেশের সমাজের গ্লানি দূর করবে, এ আশা কোরো না বউমা।... দেশকেই করতে হবে।’’

মাস্টারমশাইকে এ বাড়িতে দেখে অবাক হতে গিয়েও, সঙ্গে সরলকে দেখেই রহস্য ভেদ হয়ে গেল সত্যর কাছে।

আস্তে মাথায় কাপড়টা টেনে দিয়ে দূর থেকে আলগোছে একটা প্রণামের মতো করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

একটা নাকি প্রবাদ আছে, ‘‘বুক থেকে পাহাড় নামা।’’ ভবতোষ আসার পর-নবকুমারের সেই অবস্থা হল। থাক বাবা, আর তার করণীয় কিছু নেই। এবার সে ঘরে চৌকিতে শুয়ে পড়ে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খেতে পারে।

এখন অপেক্ষা মাস্টার আর সাহেবটার বিদেয়

হওয়া। তার পর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। বহু সহ্য করেছে সে। আর নয়। মুখুজ্জে মশাই এই মাত্র বলেছেন, ‘‘স্ত্রৈণ পুরুষেরা এই রকমই হয়।’’ সেই বাক্য-দাহ সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরাচ্ছে।

মাস্টারের সঙ্গে বেশী কথা হল না সাহেবের, শুধু সত্যর প্রেরিত চিঠিটা দেখালো সাহেব এবং একটু পরেই ‘গুডবাই’ বলে বিদায় নিল সে। ভবতোষ তাকে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসে এদের উঠোনে আর একবার এসে দাঁড়ালেন। তার-পর শান্ত গলায় বললেন ‘‘তোমার মাকে বলো সাধন, সাহেব কথা দিয়ে গেছে দোষীকে খুঁজে বের করে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে।... আর-’’, মাস্টার মশাই একটু হাসলেন, ‘‘আর তোমার মাকে অনেক অভিনন্দন জানিয়ে গেছে।’’

এতক্ষনে মুকুন্দ মুখুজ্জের গলা নিজের কাজ করে। তিনি হুঁকো হাতে দাওয়া থেকে উঠে উঠোনে নেমে এসে বলেন, ‘শুনলাম আপনি একসময় নবকুমারের শিক্ষক ছিলেন, সে হিসাবে নমস্কার জানানো উচিত তা জানাচ্ছি, কিন্তু ওই যে কি বললেন সাধনের মাকে সাহেব কি দিয়ে গেছে-’’

অভিনন্দন ! ইয়ে প্রশংসা-’’

‘‘হুঁ! বুঝেছি ! তা প্রশংসাটা কীসের ?’’

ভবতোষ একবার এই গায়ে-পড়া অভব্য বুড়োটার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তার হয়তো ব্যঙ্গের খাদ মেশানো একটু পরিহাসের ধরনের হাসি হেসে বলেন, ‘‘বুঝতে তো খুব অসুবিধে হবার কথা নয় ? সাহসের জন্য প্রশংসা করেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস কজনের থাকে বলুন ?’’

মুখুজ্জে মুখ বিকৃত করে বলেন, ‘‘লোকের ঘরে আগুন লাগাবার, লোকের মাথায় লাঠি বসাবার সাহস ও একরকম সাহস, তা সকলের থাকে না স্বীকার করছি। তবে সাহস মানেই প্রশংসা পাবার যোগ্য সেটা স্বীকার করব না।’’

‘‘না করলেই বা করবার কী আছে !’’ বলে ঈষৎ হেসে চলে যেতে চান মাস্টার। যাওয়া হয় না। নবকুমার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলে, ‘‘মাস্টারমশাই চলে গেলে চলবে না, একটু জল খেয়ে যেতে হবে !’’

বোধ করি বিপদতারণ মধুসূদনরূপী মাস্টার-মশাইয়ের পরম উপকারের একটা প্রতিদান আবশ্যক বলে মনে করার প্রতিক্রিয়া এই প্রস্তাব।

তবে মাস্টারমশাই এ প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই চমকে তাকালেন আর বোধ হয় ভাবলেন, ধৃষ্টতার কেন সীমা থাকে না।

কিন্তু একদা যে ভবতোষ মাস্টার রামকালীকে তাঁর মেয়ের শ্বশুরবাড়ির দু:খদুর্দশা বর্ণনা করে ওজস্বিনী ভাষার চিঠি দিয়েছিলেন, সেই ছেলে মানুষ ভবতোষ তো আর নেই। তার পর অনেক গুলো দিন পার হয়ে গেছে। অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে পোড় খাওয়া, আর অনেক জ্ঞান-অর্জনে পরিণত হয়ে উঠা প্রৌঢ় ভবতোষ ভয়ানক কিছু একটা জবাব দিয়ে বসলেন না। শুধু মৃদু হেসে বলেন, ‘‘পাগল ?’’

‘‘পাগল কেন ? বা: ।’’ ঋনী থাকব না এই বাসনাতেই হয়তো নবকুমার আবার জেদ করে, ‘‘এই রোদে তেতেপুড়ে এলেন। আপনার বউমার মানমর্যাদা রক্ষা করলেন, সে অমনি কেন ছাড়বে ? আপনার বউমা বলছে, একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না আপনাকে ?’’

ভবতোষ আর একবার ভয়ংকর ভাবে চমকালেন। বোধ করি কোনো একখানে হিসাব মিলাতে পারলেন না, কেমন অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, ‘‘কে ? কে ছাড়বে না বলছে।’’

‘‘এই যে আপনার বউমা।’’ চোখের ঈশারায় ইতিমধ্যেই সাধনকে দোকানে পাঠিয়ে ফেলেছে নবকুমার, তাই বুকের বল আছে। অতএব জোর

গলায় বলে, ‘‘সে এখন কলশির ঠান্ডা জল ঢেলে আপনার জন্য মিছরির পানা করছে’’- নবকুমার ভেবেছিল এই ইশারাতেই মিছরির পানা বানানো হয়ে যাবে। কিন্তু কথা শেষ করতে হয়নি নবকুমারকে।

‘‘কলশির ঠান্ডা জলের ইশারা কাজে লাগল না। সত্যবতী বেরিয়ে এসে দৃঢ়স্বরে বলল, ‘‘মিথ্যে কেন রোদে দাঁড়িয়ে পাগলের প্রলাপ শুনছেন মাস্টারমশাই ? বাসায় যান !’’

ভবতোষ সহসা একবার স্পষ্ট চোখে সত্যর মুখের দিকে তাকালেন, তার পর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে নবকুমার একটা কিম্ভূতকিমাকার কাজ করে বসলে। হঠাৎ দু-হাতে ঠাস ঠাস করে নিজেই নিজের গালে চড়িয়ে বলে উঠল, ‘‘আর কেন, এইবার একখানা জুতো এনে মুখে মারো ! ষোলোকলা সম্পূর্ণ হোক! ওই টুকুই তো বাকি আছে। স্ত্রৈণ পুরুষের ওইটাই বোধ হয় শেষ শাস্তি!’’

সামনে সদু, সামনে মুকুন্দ মুখুজ্জে, সামনে সরল, সেই মুহূর্তে সাধন সন্দেশের ঠোঙা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

সত্য কি কারও দিকে তাকিয়ে দেখে ?

বোধ হয় না।

সত্য নি:শব্দে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। আর বোধ করি ফেলে ছাড়িয়ে চলে যাওয়া হাতের কাজটা আবার গুছিয়ে তুলতে থাকে।

সদুতে সদুর স্বামীতে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়। তার পর সদু উত্তেজিত নবকুমারকে বসিয়ে একখানা হাতপাখা দিয়ে মাথায় বাতাস দিতে দিতে খাদে গলা নামিয়ে বলে, ‘‘আর ক্ষেপে উঠে কি করবি ভাই ? এতদিনে তো সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। চিরদিন মাথাটা একটু ‘ইয়ে’ ছিল, এখন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তোর কপালে ভগবান এমন তেঁতুল গুলবেন, তা কখনও ভাবি নি।’’

মামীর কাছে থাকতে সদুর যেমন ধারালো পরিষ্কার কথাবার্তা ছিল, তেমন যেন আর নেই। সদু গেরস্থর গিন্নি হয়েছে। তাই গিন্নিদের মতো কথা রপ্ত করছে।

নবকুমার বলে, ‘‘এক ঘটি জল দাও সদুদি!’’

সদু তাড়াতাড়ি জল এনে হাতে দিয়ে বলে, ‘‘খা, খেয়ে এইবার মনের বল করে-কবিরাজ ডেকে এনে চিকিৎসা করা। নেহাত হাতে পায়ে ছেকল না পরাতে হয়, সেটা তো দেখতে হবে।’’

নবকুমারের বোধ করি জল খেয়েই বল বাড়ে। সে বীরবিক্রমে বলে, ‘‘পাগল না হাতি। সব বদমাইশি ! লোকের সামনে আমাকে হেয় করাই ওঁর একমাত্র কাজ। জীবন-ভোর তাই দেখলাম।’’

শব্দার্থ

চাতুরী = চালাকী
ফতুয়া = ঢিলাজামা
এনকোয়ারি = তদন্ত
নিবৃত্ত = থামানো
আদালত = যেখানে বিচারের কাজ হয়।
বীর বিক্রমে = অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে
ওজস্বিনী = জ্বালাময়ী
গ্লানি = ময়লা, অবসাদ
লাঞ্ছনা = নির্যাতন।
বিবৃতি = বর্ণনা করা
ভয়ানক = ভীতিজনক
ব্যাকুলতা = আগ্রহ
পরামর্শ = যুক্তি
বিপদতারন = বিপদ থেকে উদ্ধার
অনিবার্য = যা নিবারণ করা যায়না
বাংলা-নবিশ = বাংলা শিখছে এমন

অনুশীলনী

১. আকলন

অ) ছক পূর্ণ করো :-

(১)

যে সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে লড়াই করছে

(২)

যে কারণে দুজনে অধৈর্য হয়ে পড়ে

(৩)

মারা মারি করে যা হবে

আ) ছক পূর্ণ করো :-

(১)

শহরবাসীরা যাহা ডাই করে রাখে

(২)

স্টেশন মাস্টারের কাছে গেল

(৩)

খিদেয় যারা কাতর

ই) ছক পূর্ন করো :-

(১)

স্টেশনের ছোটো বাবু বৃদ্ধের স্পর্ধায় যা হলেন

(২)

সামন্ত মশায়ের শারীরিক অবস্থা

৩)

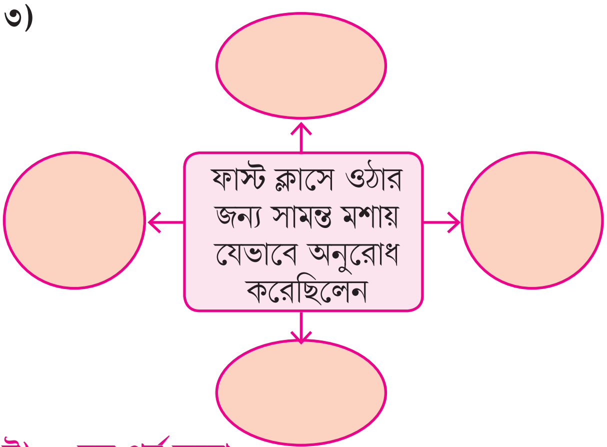

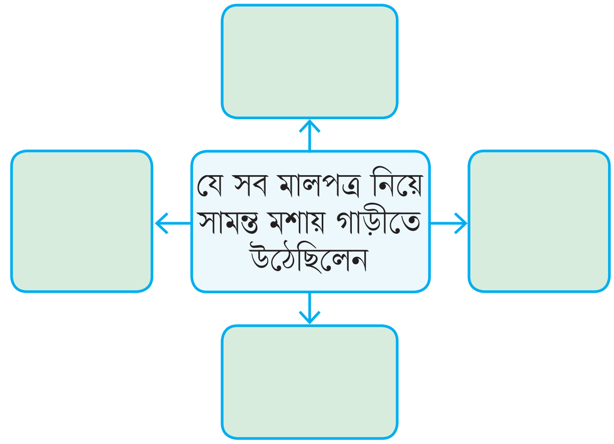

ঈ) ছক পূর্ন করো :-

(১)

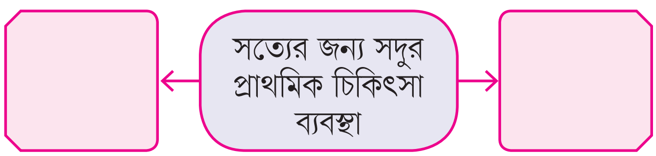

(২)

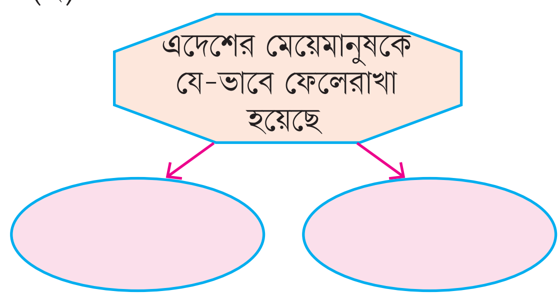

(৩)

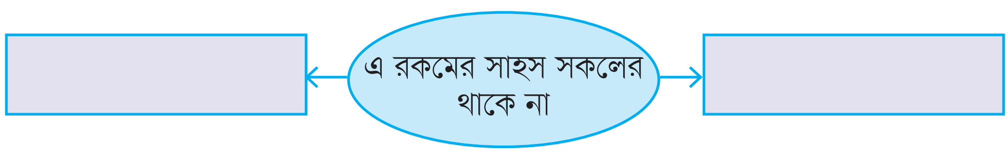

২. কারণ লেখ

অ) (১) হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল...
(২) প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না...
(৩) বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন...

আ) (১) মর্দানার পরিস্থিতি দেখে গুরু ধ্যানে বসলেন...
(২) মর্দানা নেমে এসে নালিশ জানাল...
(৩) বলী কান্ধারী নানককে গালাগাল করলেন...

ই) (১) শ্রীপতি সামন্ত সমস্ত প্লাটফর্মটাময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন।
(২) অদ্য শ্রীপতি সামন্তের নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন...
(৩) শ্রীপতি সামন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন...

ঈ) (১) সদু, রাত্রিতে সত্যের কাছে না থেকে বিদায় নিল...
(২) সুবর্ণকে কম বয়সে বিয়ে দেওয়া যাবে না...
(৩) সত্যের বাড়িতে পুলিশ এসেছিল...

৩. অভিব্যক্তি

অ) ১) ‘‘জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য ভ্রাতৃত্ববোধের- একান্ত প্রয়োজন।’’
- এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

২) ‘‘অন্য মানুষও আমার মতো মানুষ এই বোধ প্রত্যেকের মধ্যে জাগ্রত হওয়া উচিত।’’
- এ ব্যাপারে তোমার মতামত ব্যক্ত করো ?

৩) ‘‘সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গা অকল্যাণ ডেকে আনে।’’- এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

আ) ১) ‘জননী এবং জন্মভূমির স্থান স্বর্গেরও উপরে’ - এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

২) ‘স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার মনোভাব থাকা দরকার।’ এ সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

ই) ১) ‘সকলের সাথে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত।’- এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

২) ‘মাতৃভাষার প্রতি প্রত্যেকের অনুরাগ থাকা দরকার।’- এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৩) ‘‘কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে নেই।’’- এ ব্যাপারে তোমার অভিমত প্রকাশ করো।

৪) ‘‘পারোপকার পরম ধর্ম।’’- এ ব্যাপারে তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করো।

ঈ) ১) ‘বাল্য বিবাহ একটি সামাজিক অপরাধ’- এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

২) ‘সমাজের গ্লানি সমাজের লোককেই দূর করতে হবে।’ এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৩. লঘুত্তরী প্রশ্ন

অ) ১) আদাব গল্পের সুতামজুর এবং নৌকার মাঝি কী ভাবে একে অপরের পরিচয় জানতে পেরেছিল ?

২) সুতামজুর ও মাঝির মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তা সংক্ষেপে লেখ।

৩) আদাব গল্প সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গার বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ। আলোচনা করো।

৪) নৌকার মাঝি কী ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার শিকার হয়েছিল ?

৫) নৌকার মাঝি কীভাবে হিন্দু জমিদার বাবুর থেকে উপকৃত হয়েছিল ?

আ) ১) ‘গুরু গভীর সমস্যায় পড়লেন’- কোন ঘটনায় গুরুকে সমস্যায় পড়তে হয় ?

২) গুরু নানক কীভাবে শিষ্য মর্দানার জলতেষ্টা মিটিয়েছিলেন ?

৩) পাঞ্জাসাহেবের আশ্চর্য ঘটনাটি সম্পর্কে যাহা জানো লেখ।

৪) অলৌকিক গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

ই) ১) শ্রীপতি সামান্তের চরিত্র বৈশিষ্ট্য লেখ।

২) শ্রীপতি সামন্ত কী কী মালপত্র নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন ?

৩) প্রথম শ্রেণীর বাঙালি সাহেব যাত্রিটির সঙ্গে শ্রীপতি সামন্তের স্বভাব চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করো।

৪) শ্রীপতি সামন্তের আজ ঘুম হওয়ার একান্ত প্রয়োজন কেন ?

ঈ) ১) কোন পরিস্থিতিতে সত্যবতী স্বামীর কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল এবং সেই প্রতিশ্রুতি কি ছিল ?

২) সত্য যে সমাজের পরিবর্তন চেয়েছিল তা কোন ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ?

৩) সত্য যে সাহসী এবং স্পষ্টবাদী তা আমরা কোন ঘটনার মধ্যে জানতে পারি ?

৪) নবকুমার কীভাবে মাস্টার মশাই ভবতোষের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন ?

১৪. রেডিও জকি

- শ্রীমতী ঋষিতা নীলাশীষ মন্ডল

লেখক পরিচিতি

শ্রীমতী ঋষিতা নীলাশীষ মন্ডল ৬ই জুলাই ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সল্টলেক অঞ্চলে জন্মগ্রহন করেন। পিতার নাম শ্রী প্রদীপ কুমার দত্তরায় এবং মাতা শ্রীমতী স্বপ্না দত্তরায়। ইনি Methodish school ডানকুনি কোলকমপ্লেক্স হুগলী থেকে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন । এর পর Techno-India-ICSE হাজরা কোলকাতা থেকে সাংবাদিককতা ও ইংরাজী সাহিত্য নিয়ে এম.এ.পাশ করেন। বি.এড. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। উনি সঙ্গীত ও কথক নাচে বিশেষ পারদর্শী এবং কথক নৃত্যে লক্ষ্ণৌ ঘরানা থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। বর্তমানে ইনি সেক্সপিয়ারের সাহিত্যের উপর গবেষণা রত।

পাঠের মূলকথা

রেডিও জকি আধুনিক সময়ে একটা জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় পেশা। রেডিও জকি হওয়া এখন তরুণ প্রজন্মের কাছে অনেক ডিমান্ডিং। এ পেশাতে শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে বেশী প্রয়োজন কাজের দক্ষতা ও এই পেশার প্রতি ভালোবাসা। সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলার অভ্যাস করতে হয়। আর জের কথা মজাদার ও অনুপ্রেরণা দেওয়ার মতো হতে হবে। একজন সফল আরজেকে শব্দভান্ডার বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে হবে। একজন আরজেকে মানসিক সন্তুলন ঠিক রাখা একান্ত প্রয়োজন যাতে তিনি হাসি মুখে কথা বলে মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন। বিভিন্ন রেডিও স্টেশনে কিছুদিন পর-পর আর জে নিয়োগ করে। আর জে হতে হলে দুটি ধাপে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়- সাক্ষাৎকার ও ভয়েস টেষ্ট। একজন আরজে সমাজ সচেতনতার কাজ করতে পারে।

(রেডিও জকি প্রতুল সেনগুপ্তর সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের যুবক শ্রীমান সপ্তনীলের সাক্ষাৎকার)

সপ্তনীল : নমস্কার প্রতুল বাবু। আপনাকে সুস্বাগতম।

প্রতুলবাবু : ধন্যবাদ সপ্তনীল। আমি খুব খুশি যে তোমাদের মত তরুণ প্রজন্মের ছেলেরা রেডিও জকি সম্বন্ধে জানতে চাইছ।

সপ্তনীল : আচ্ছা! প্রতুলবাবু বলুন তো রেডিও জকি সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

প্রতুলবাবু : রেডিও জকি বা কথা বন্ধু, আধুনিক সময়ে একটা জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় পেশা, এক জন মানুষ সুমধুর কন্ঠে মুগ্ধ করছে হাজার- হাজার শ্রোতাদের। তাকে না দেখে, না জেনেও মানুষ বন্ধুর মতো তাকে মেসেজ করছে প্রকাশ করছে তার মনের ভাব।

রেডিও স্টেশনে বসে কথা বলছে আর জে, আর শুনছে হাজার-হাজার মানুষ। কেউ ফোনে

আর কেউবা চলার গাড়িতে কারো বা আবার ঘুমাতে যাবার আগে প্রিয় আর জের, শো না শুনলে ঘুমই আসতে চায় না। জনপ্রিয়তার জন্য হোক অথবা এ পেশার প্রতি ভালোবাসার জন্য হোক রেডিও জকি হওয়া এখন তরুণ প্রজন্মের কাছে অনেক ডিমান্ডিং একটি শখ, নেশা ও পেশা। রেডিও নিয়ে কেরিয়ার গড়তে চাইলে একটা ধারণা সবার আগে পরিষ্কার করতে হবে। রেডিও স্টেশন দু রকমের হয়। একদম টিভি চ্যানেলের মতো। সরকারি আর বেসরকারি। রেডিও স্টেশন বলতে আমাদের দেশে আকাশবাণী। যার প্রায় প্রতিটি শহরেই মিডিয়াম ওয়েভ ও এফ, এম স্টেশন রয়েছে। আর বেসরকারি চ্যানেল বলতে বড়-বড় গ্রুপের মালিকানাধীন বিভিন্ন এফ-এম স্টেশন এদের মিডিয়ম ওয়েভ নেই বেশীর ভাগই এফ-এম।

সপ্তনীল : আচ্ছা রেডিও জকি হতে গেলে শিক্ষাগত যোগ্যতা কি থাকতে হবে ?

প্রতুলবাবু : রেডিও জকি হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা হল, কম পক্ষে স্নাতক ডিগ্রি জরুরী। এছাড়া পার্ট টাইম আর জে হিসেবে যে কোন বেতারে যোগ দিতে পারে যাঁরা স্নাতোকোত্তর অধ্যয়ন অবস্থায় যদি শখ থাকে রেডিও তে কাজ করার তবে সে ক্ষেত্রে ব্যাচেলার ডিগ্রি কমপ্লিট করতে পারেন Broadcasting, Media studies and Journalism ইত্যাদি বিষয়ে। এতে একদিকে তুমি যখন কাজ শিখবে, জানাবে ও পরবর্তী জীবনে তা কাজেও লাগাতে পারবে। তার মানে এই না অন্য বিষয়ে পড়াশোনা করলে আর জে হওয়া যাবে না। অনেক মেডিকেল, ইনঞ্জিনিয়ারিং ওকালতি পড়েও আর জে হিসাবে কাজ করছেন বিভিন্ন নাম করা রেডিও স্টেশনে। সুতরাং এ পেশাতে শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে বেশী প্রয়োজন কাজের দক্ষতা ও এই পেশার প্রতি ভালোবাসা।

সপ্তনীল : আচ্ছা স্যার আর জে হতে হলে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কি ?

প্রতুলবাবু : হ্যাঁ, এর প্রয়োজন আছে। কারণ স্টেশন কম, কিন্তু আরজে হতে চায় সবাই। তাই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে নিজেকে দক্ষভাবে গড়ে তুলতে হবে। সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলা একটা আর্ট। অনেকেই তা পারে আবার অনেকে তা পারে না। কিন্তু নিয়মিত অভ্যাসে এসব রেডিও জকি কোর্সের মাধ্যমে খুব সহজেই কথাবলার অভ্যাস আয়ত্ব করতে পারা যায়। বর্তমান 'জবস্ এ ওয়ান কম সংবাদ, উপস্থাপনা ও রেডিও জকির জন্য কোর্স পরিচালনা করছে। এছাড়া বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এ কাজটি করে থাকে। এ সব একাডেমীতে ক্লাস নেন স্বনামধন্য সব আর জে সংবাদ পাঠকরা। আরও ভালো ভাবে শিখতে চাইলে ব্যক্তিগত ভাবে কোন একজন অভিজ্ঞ রেডিও জকির অধীনে থেকে হাতে কলমে শেখা যায়।

সপ্তনীল : স্যার একজন আর জে হতে হলে কি ধরনের নিজস্ব প্রস্তুতি নিতে হবে ?

প্রতুলবাবু : একজন আর জে হতে হলে কিছু নিজস্ব প্রস্তুতি নিতে হবে যা ঘরে বসে একা একাও নেওয়া যায়।

আরজে র কথা মজাদার ও অনুপ্রেরণা দেওয়ার মতো হতে হবে। বোরিং হলে আরজেরে কথা শুনে কেউ মজা পাবে না। তাই নিজেকে এক্সট্রোভার্ট হিসাবে গড়ে, তুলতে হবে। মানুষের

সাথে মেশা, কথা বলা, ভালো সেন্স অব হিউমার থাকা, মজা করা, আড্ডা দেওয়া, এ অভ্যাস গুলো পরবর্তীতে একজন ভালো রেডিও জকি হতে সহায়ক হবে।

সপ্তনীল : আর জে হতে হলে কিছু রিসার্চের প্রয়োজন আছে কি ?

প্রতুলবাবু : আরজে রা এফ-এম রেডিওর কোন একটি গান প্লে করার আগে ঐ গানের সংগীত শিল্পি, সুরকার, লেখক, কোন সিনেমার গান হলে ঐ সিনেমার একটু বর্ণনা এসব কিছু আর জে কে রিসার্চ করে জানতে হবে। তাই ভালো আর জে হতে হলে রিসার্চের বিকল্প নেই।

সপ্তনীল : আচ্ছা স্যার, স্ক্রিপ্ট লিখে নেবার প্রয়োজন আছে কি ?

প্রতুলবাবু : হ্যাঁ, তা আছে বৈকী, অনেক ভালো-ভালো আর জে রাও শো করার আগে স্ক্রিপ্ট লিখে নেয়। রেডিওতে আরজে যে গানের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলেন এটাকে লিঙ্ক বলে। একটি লিঙ্কের তিনটি ভাগ থাকে । Intro (সূচনা), Extro (উপসংহার), এবং মাঝের অংশ (Middle portion) Intro তে হ্যালো হাই ইত্যাদি দিয়ে ওয়েল কাম জানানো হয়, Extro তে কথা বলা শেষ করা হয়। প্রতিটি লিঙ্কের সময় ৫ মিনিট হতে পারে । তাই এত অল্প সময়ে এত কথা গুছিয়ে বলাটাও বেশ কষ্ট সাধ্য। তাই স্ক্রিপ্ট লিখে-লিখে কথা বলার অভ্যাস করতে হবে। এভাবে অভ্যাস করতে করতে এক সময় নিজ থেকেই অনেক কিছু বের হয়ে আসবে মুখ থেকেই।

সপ্তনীল : একজন আর জেকে নিজের ভাষার উপর আয়ত্ব রাখার কি ধরনের প্রচেষ্টা করতে হবে?

প্রতুলবাবু : ইদানিং তরুণ প্রজন্মের মাঝে বাংলা ও ইংরেজী মিশিয়ে এক ধরনের ভাষায় কথা বলতে দেখা যায় । হাসি ঠাট্টা করে এ স্টাইলের নাম দেওয়া হয়েছে বাংলিশ ভাষায় কথা বলা।

একজন আরজের সবচেয়ে বড় গুণ হল শুদ্ধ উচ্চারণ করা, ইংরেজী কথা বলার সময় শুধু ইংরেজী ও বাংলা কথা বলার সময় শুধু বাংলাতে বলতে হবে। এই অভ্যাসটা এখন থেকেই আয়ত্ব করতে হবে।

লক্ষ্য করতে হবে (BBC, CNN) এর ইংরাজী নিউজ চ্যানেল গুলো, নিয়মিত ইংরেজী গান শোনা ও সিনেমা দেখার অভ্যাস রাখতে হবে। বাংলা শেখার জন্য ফলো করতে হবে কোন রেডিও স্টেশনের শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা ভালো আর জে কে। তবে এক্ষেত্রে ফলো করা মানে হুবহু কপি করা নয়। নিজস্বতা বজায় রাখতে হবে। বাক-পটুতা বাড়ানোর জন্য লোকের সঙ্গে কথা বার্তা বলা, বই, খবরের কাগজ, ও বিখ্যাত বক্তার বক্তৃতা শোনার প্রয়োজন। এতে শব্দভান্ডার বৃদ্ধি পাবে। নিজের কাজের উন্নতি সুদৃঢ় করার জন্য ভাষার শালীনতা মনোরঞ্জক ভাষার ব্যবহার, প্রবাদ প্রবচন এর প্রয়োগ যথাযথ হওয়া চাই।

সপ্তনীল : একজন সফল আর জে হতে হলে মানসিক স্থিতি কেমন হওয়ার প্রয়োজন ?

প্রতুলবাবু : সফল আর যে হতে হলে মানসিক সন্তুলন ঠিক রাখাটা একান্ত প্রয়োজন। এক জন মানুষ ২৪ ঘন্টা হাসি-খুশি থাকবে, খুব মজার মজার কথা বলবে ব্যাপারটা কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু একজন ভালো আর জে এই চ্যালেঞ্জিং কাজটাই করে খুব সুন্দর ভাবে। নিজের রাগ দু:খ কষ্ট সব কিছু দমিয়ে রেখে খুব হাসি মুখে কথা বলা ও এরকম একটা মানসিক অবস্থাতেই নিজের কথা দিয়ে মানুষ কে বিনোদন দেওয়া, তাও এমন মানুষ কে যে তোমার সামানে নেই।

কাজটা কতটা চ্যালেঞ্জিং একবার ভাবো। কিন্তু আর জে রা এ কাজটিই করে যাচ্ছে হাসি মুখে। তাই আর জে হতে গেলে ধৈর্যশক্তি বাড়ানো ও নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার কোন বিকল্প নেই।

সপ্তনীল : আর জে হতে হলে নিয়মিত সংস্কৃতির চর্চা করার কি খুব বেশী প্রয়োজন আছে?

প্রতুলবাবু : আছে বৈকি ! অধিকাংশ আর জে ব্যক্তিগত জীবনে গান আবৃত্তি, উপস্থাপনা, সংবাদ. পাঠ, নাচ ইত্যাদির সাথে যুক্ত, কারণ এক্ষেত্রে নিজের আওয়াজের, চর্চা হয়। অন্যদিকে কণ্ঠশিল্পী হিসাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা পেশাগত জীবনে আর জে হিসেবে মনোবল বাড়বে। তাই নিয়মিত সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। সব রকম গান শুনতে হবে। আঞ্চলিক গান থেকে শুরু করে ওয়াল্ড ডাটা বুস্টার কোনটা টপে রয়েছে। তাও জেনে রাখতে হবে।

সপ্তনীল : একজন সফল আর জে হতে গেলে তার ব্যক্তিত্ব কেমন হতে হবে ?

প্রতুলবাবু : যে কোন পেশাতেই সফল হত হলে তার ব্যক্তিত্বের উপর অনেকটাই নির্ভর করে। ফেস বুকের যুগে প্রতিটা আর জে তাদের ফ্যান ফলোয়ারদের সাথে কন্টাক্টে থাকেন। তাই বেশী মানুষের সাথে মেশা ও বন্ধু তৈরী করা পরবর্তী কালে একজন প্রিয় আর জে হতে সাহায্য করবে। আর জে মানুষের বন্ধু। কথাবন্ধু কোন সেলিব্রিটি না । এই মানসিকতা রাখা আর জে-র ই দর্শক প্রিয় হোন বেশী একজন ভালো জকি জানে তার টার্গেট, শ্রোতা কারা ও তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারি এই নীতিতে বিশ্বাসী। বাঙালী সমাজে রেডিও জকি হতে হলে নিজেকে ঐ ভাবে তৈরী করতে হবে । ব্যাপারটা এমন না যে অতিমাত্রায় মডার্ন, কাপড় পরে, উগ্র হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তোমাকে যেমন তেমন ভাবে নিজেকে ফিট ফাট সজ্জিত ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে হবে। একজন আর জে কে হাজার হাজার মানুষ ফলো করে, তার মতো হতে চায়। তাই নিজের ব্যক্তিত্ব ঐভাবে গড়ে তুলতে হবে।

সপ্তনীল : স্যার আপনার থেকে আর জে সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরে খুব উপকৃত হচ্ছি। এবারে আমাকে বলুন রেডিও জকির নিয়োগ কি ভাবে হয়?

প্রতুলবাবু : প্রত্যেক রেডিও স্টেশনে কিছুদিন পর পর আর জে নিয়োগ করে। কখনো কখনো আর জে হান্টের ও ব্যবস্থা থাকে। অল ইন্ডিয়া রেডিও তে চাকরীর জন্য স্টাফ সিলেকশন কমিশন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর পরীক্ষা হয়। নিয়মিত খোঁজ রাখতে হবে এফ এম গুলোর ফেস বুক পেজ ও ওয়েব সাইটের-খবরে। এই পরীক্ষা গুলোতে প্রথমে পাশ করতে হবে। আর জে হতে হলে সাধারনত দুটি ধাপে নির্বাচন সম্পন্ন হয়, সাক্ষাৎকার ও ভয়েস টেস্ট। তারপর নির্বাচিত প্রার্থীদের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা হয়। প্রাইভেট চ্যানেলে প্রার্থীদের শিল্পকলার প্রতিভা যাচাই করা হয়। এখানে উপস্থাপনা, বাচনভঙ্গী, অভিজ্ঞতা, নিজস্ব চেষ্টা, দক্ষতা এসব কিছুর উপর ভিত্তি করে সেরা প্রার্থীকে নির্বাচন করা হয় আর জে পদের জন্য। রেডিও-জকির জন্য জ্ঞান ও তার অভিজ্ঞতার প্রায়োজন হয়। প্রশিক্ষণের সময় শেখানো হয়-কনসোল চালানো, শো-ডিজাইন করা-বাচনভঙ্গি প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি সব কিছু। অর্থাৎ একজন পূর্নাঙ্গ রেডিও জকি হতে গেলে যা যা প্রয়োজন তা সবই শেখানো হয়।

সপ্তনীল : স্যার আমার মনে হয় এক জন আর জে সমাজের জাগরুকের কাজ করতে পারে।

প্রতুলবাবু : তোমার কথা একদম ঠিক । কোন কাজই সমাজ কে দূরে রেখে হয় না। একজন আর জের কাজ সমাজের প্রত্যেক স্তরে সংযোগ রাখা। যেমন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে (পরিবেশ দিন পোলিয়ো অভিযান, জল সাক্ষরতা, শিশুশ্রমিক, পনপ্রথা, কন্যা সাক্ষরতা, বিশ্ব পুস্তক দিবস, কৃষক ও চাষবাসের গুরুত্ব, নেশামুক্তি, ভোটদান জাগরুকতা প্রভৃতি) বিষয়ের উপর চর্চা করে মনোরঞ্জনাত্মক পরিবেশনের মাধ্যমে লোকের মধ্যে জাগরুকতা প্রসারণের কাজ করে।

সপ্তনীল : আরজে কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করলে এর ভবিষ্যত কি হবে ?

প্রতুলবাবু : এই পেশার সেরা দিক হল শ্রোতাদের ভালোবাসা, প্রিয় আর জে-র জন্য পাগল প্রায় থাকে সবাই। এক পলক নিজের আর জে কে কাছ থেকে দেখার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা যে ভালোবাসা তা তুমি কোটি টাকা দিয়েও কিনতে পারবেনা। আর বিশেষ দিবসে শ্রোতা থেকে উপহার উইশ সারপ্রাইজ তো আছেই। এক জন অচেনা মানুষ হয়েও শ্রোতাদের খুব কাছের মানুষ হবে। এমন কথা আছে কাউকে বলছে না তোমাকে বলছে। এটা সত্যি বড় পাওনা।

আর জে পেশা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য সেরা। একজন আর জে অনেক কনফিডেন্ট ও স্মার্ট হয়। তাই অনেক আরজে ভবিষ্যতে আর জে থেকে মডেল উপস্থাপক, সংবাদ পাঠক, অভিনেতা নায়ক-নায়িকা লেখক, সাংবাদিক ইত্যাদি নানা পেশাতে সুন্দরভাবে মানিয়ে নেন ও কাজও করেন দক্ষতার সঙ্গে। এরকম অনেক ব্যক্তিত্ব আছেন যাদের ক্যারিয়ারের শুরু হয়োছিল আর জে হয়ে। রেডিও জকি কথাবন্ধু যে নামেই ডাকি না কেন এ পেশায় আসতে হলে সবচেয়ে যা বেশী প্রয়োজন তা হল পেশার প্রতি ভালোবাসা। আপনার হাতে ক্ষমতা

থাকবে যে আপনি তাদের হাসাতে পারবেন, ভালো লাগাতে পারবেন, কথাবন্ধু হয়েও বন্ধুর মতো পাশে থাকতে পারবেন । তাই যারা এ পেশায় আসতে চান তাদের কাছে অনুরোধ ভাষা বিকৃত করবেন না। নিজের পুরো ভালোবাসা দিয়ে কাজটা করুন।

সপ্তনীল : ধন্যবাদ স্যার। আজ আপনি রেড়িও জকির বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের খোঁজখবর, রোজগারের সুযোগ সুবিধার কথা প্রভৃতির উপর যেভাবে আলোকপাত করলেন তা আমাদের কাছে এবং আমাদের বিদ্যার্থীদের কাছে প্রেরণাদায়ক হবে।

অনুশীলনী

অ) (১) একজন আরজেকে নিজের ভাষার উপর আয়ত্ব রাখার জন্য কি ধরনের প্রচেষ্টা করতে হবে?

(২) একজন সফল আরজে হতে গেলে মানসিক স্থিতি কেমন হওয়া প্রয়োজন ?

(৩) একজন সফল আরজে হতে গেলে তার ব্যক্তিত্ব কেমন হবে ?

(৪) রেডিও জকির নিয়োগ কীভাবে করা হয় ?

(৫) আরজেকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করলে তার ভবিষ্যৎ কেমন হবে ?

আ) (১) রেডিও জকির শিক্ষাগত যোগ্যতা কি থাকতে হবে?

(২) আরজে হতে হলে কি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ?

(৩) আরজে হতে গেলে কি প্রস্তুতি নিতে হবে?

(৪) একজন আরজের স্ক্রিপ্ট লিখে নেবার প্রয়োজন রয়েছে কেন ?

(৫) সমাজের জাগরুক হিসাবে একজন আরজে কীভাবে কাজ করতে পারে?

১৫. ব্লগ লেখন

- শ্রীমতী মঞ্জুরাণী সিং

লেখক পরিচিতি

শ্রীমতী ২১ ই জানুয়ারী ১৯৫৬ সালে বিহারের ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত আভারতন পুর গ্রামে তার জন্ম । পরে তিনি সপরিবারে ভাগলপুর চলে আসেন ও তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রী হলধর প্রসাদ সিং ছিলেন এজুকেশনাল গ্যাজেটেড অফিসার, মাতা ছিলেন শিক্ষিতা কুশল গৃহিনী। পরবর্তী কালে মঞ্জুরানী সিং পশ্চিম বঙ্গের বীরভুম জেলার অন্তর্গত, বোলপুর, শান্তিনিকেতনে এ আসেন। তিনি কবিগুরুর হাতে গড়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর হিন্দী বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর এম.এ. ও পী.এইচ.ডী. ডিগ্রী গ্রহণ করেন । পরবর্তী কলে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগেই শিক্ষিকা, অধ্যক্ষ ও বিশ্বভারতীর অন্তর্গত স্ত্রী অধ্যয়ন কেন্দ্রের নির্দেশিকার (Director) পদে নিযুক্ত থাকেন। তিনি বিশ্ব-ভারতীর শিক্ষিকা থাকতে থাকতে বাংলা, উড়িয়া, মারাঠী, রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে ও জ্ঞান অর্জন করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সাহিত্যিক পত্র পত্রিকায় তাঁর নিজের মাতৃভাষা সহ বাংলা উড়িয়া, মারাঠী ভাষায় বিভিন্ন লেখা ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তিনি বিভিন্ন ভারতীয় প্রতিষ্ঠিত সংস্থার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন।

পাঠের মূলকথা

ব্লগ শব্দটি ইংরেজী (Blog) এর প্রতিশব্দ যাকে একধরনের অনলাইন ব্যক্তিগত দিনলিপি বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক পত্রিকা বলাযেতে পারে । লেখা, ছবি, অন্যব্লগ, ওয়েব পৃষ্ঠা, এ বিষয়ের অন্য ওয়েব সাইটের লিংক ইত্যাদির সমাহার হলো একটি ব্লগ। ব্লগ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যারা ব্লগিং করে তাদের কে ব্লগার বলা হয়। সময়ের সাথে সাথে ব্লগের উপস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। ব্লগার হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। ব্লগ এর সাহায্যে বর্তমান যুগে উপার্জন করা সম্ভব হয়েছে। এই কাজে কোনো সীমাবদ্ধতা না থাকায় মানুষ বিভিন্ন পথ অধিগ্রহণ করতে পারে।

✪ ব্লগ কাকে বলে ও তার প্রকার ?

ব্লগ শব্দাটি ইংরেজি Blog এর বাংলা প্রতিশব্দ, যাকে এক ধরনের অনলাইন ব্যক্তিগত দিনলিপী বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক পত্রিকা বলা যেতে পারে। ইংরেজি Blog শব্দটি এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যিনি ব্লগে পোস্ট করেন তাকে ব্লগার বলা হয়। ব্লগাররা প্রতিনিয়ত তাদের ওয়েবসাইটে কনটেন্ট যুক্ত করেন আর ব্যবহারকারীরা সেখানে তাদের মন্তব্য করতে পারেন। এছাড়াও সাম্প্রতিক কালে ব্লগ ফ্রিলান্স সাংবাদিকতার একটা মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক ঘটনাসমুহ নিয়ে এক বা একাধিক ব্লগাররা তাদের ব্লগ হালনাগাদ করেন।

বেশিরভাগ ব্লগই কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়সম্পর্কিত ধারাবিবরণী বা খবর জানায়। বাকীগুলো ব্যক্তিগত অনলাইন দিনলিপী। লেখা, ছবি, অন্য ব্লগ, ওয়েব পৃষ্ঠা, এ বিষয়ের অন্য ওয়ের সাইটের লিংক ইত্যাদির সমাহার হলো একটি ব্লগ। পাঠকদের মন্তব্য করার সুযোগ দেওয়াব্লগের অন্যতম একটি দিক। সব ব্লগই মূলত লেখাভিত্তিক (টেক্সট-বেসড)। কিন্তু কিছু ব্লগ আবার শিল্প (আর্ট ব্লগ), ছবি (ফটোব্লগ), ভিডিও (ভিডিও ব্লগিং) সঙ্গীত (এমপিথ্রিব্লগ) আর অডিও (পোডকাস্টিং) ইত্যাদির উপর গড়ে উঠেছে।

মাইক্রোব্লগিং-ও আরেক ধরনের ব্লগিং যেখানে পোস্টের আকার তুলনামূলক ছোট থাকে। জুন, ২০১৭-এর হিসেবে ব্লগ সার্চ ইঞ্জিন প্রায় বাইশ মিলিওনেরও বেশি ব্লগের হদিশ পেয়েছে।

✪ ব্লগ লেখার ইতিহাস :-

১৯৯৭ এর ১৭ ই ডিসেম্বর, "জর্ন বার্গার" নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম Webblog শব্দটির উদ্ভাবন করেন। ১৯৯৯ এর মার্চ বা এপ্রিলের দিকে, পিটার মেরহোলজ তার নিজস্ব ব্লগ পিটার্ম ডট কমে কৌতুক করে Webblog শব্দটিকে ভাগ করে blog বলে সম্বোধন করেন । তারপর থেকে blog শব্দটির ব্যবহার বাড়তে থাকে। ইভান উইলিয়ামস নামের এক ব্যক্তি blog শব্দটিকে যথাক্রমে 'বিশেষ্য' ও 'ক্রিয়াপদ' - দুভাবেই কাজে লাগান। তিনিই blogger কথাটির উদ্ভাবন করেন। 'ব্লগিং'-এর জনপ্রিয়তার পূর্বে 'ডিজিটাল সম্প্রদায়' এর অন্যান্য জনপ্রিয় মাধ্যমগুলো ছিলো Usenet, GEnie, Bix, Compuserve, BBS ইত্যাদি। তখনকার জন্য এগুলো জনপ্রিয় হলেও এগুলোর সাহায্যে খুব কষ্ট করেই Running Conversation - এর কাজগুলো করা যেতো। কিন্তু আধুনিক ব্লগিং এর সুবাদে মানুষ এখন খুব সহজেই সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছে।

যারা ব্লগিং করে, তাদেরকে বলা হয় ব্লগার । ব্লগাররা সাধারণত নিজেদেরকে Diarists বা Journalers ও বলতে পারে। Justin Hall, যিনি ব্যক্তিগত ব্লগিং শুরু করেছিলেন ১৯৯৪ সালে। তখন তিনি swarthmore college - এ পড়তেন। তাকে ধরা হয় ব্লগিং - এর ইতিহাসের সবচেয়ে পুরনো ব্লগার। সেই সময়ের চলমান কিছু জনপ্রিয় ব্লগের মধ্যে Jerry Pournelle এবং Dave Winer's – এর পার্সোনাল ব্লগ ছিলো অন্যতম। এ গুলো ছিলো সবচেয়ে পুরনো এবং দীর্ঘসময় ধরে চলা জনপ্রিয় ব্লগ। ব্লগিং এর জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে এর চাহিদাও বাড়তে থাকে । এতে যোগ হয় বিভিন্নরকম প্রযুক্তি।

১৯৯৯ থেকে ব্লগিং- এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং যা এখনও বাড়ছে। ব্রুস এবলসন নামের এক ব্যক্তি ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে ওপেন ডায়েরি' নামক একটি ব্লগ খোলেন এবং রাতারাতি তার ব্লগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। হাজার হাজার ব্লগার তার ব্লগের সাথে যুক্ত হন এবং এটিই সর্বপ্রথম ব্লগকমিউনিটি যেখানে, অন্যান্য ব্লগারদের লেখায় মন্তব্য করার সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়া Evan Williams এবং Meg Hourihan যারা pyra Lab– এ কাজ করতেন এরা ১৯৯৯ সালে তাদের নিজস্ব ব্লগ সাইট চালু করেন, যা ফেব্রুয়ারি ২০০৩ এ গুগল কিনে নেয়।

✪ ব্লগ এর কাঠামো :-

সময়ের সাথে ব্লগের উপস্থিতি পরিবর্তিত এবং আজকাল ব্লগে বিভিন্ন আইটেম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে, বেশিরভাগ ব্লগে কিছু মানক বৈশিষ্ট্য এবং কাঠামো অন্তর্ভুক্ত থাকে। এখানে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে যা একটি সাধারণ ব্লগের অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

১) মেনু বা নেভিগেশন বার সহ শিরোনাম।

২) হাইলাইট বা সর্বশেষ ব্লগ পোস্ট সহ প্রধান সামগ্রীর ক্ষেত্র।

৩) সামাজিক প্রোফাইল, পছন্দসই সামগ্রী, বা কল-টু-অ্যাকশন সহ সাইডবার।

৪) অস্বীকৃতি, গোপনীয়তা নীতি, যোগাযোগের পৃষ্ঠা ইত্যাদির মতো প্রাসঙ্গিক লিঙ্কযুক্ত পাদলেখ।

উপরোক্ত উদাহরণস্বরূপ ব্লগের মূল কাঠামো। প্রতিটি ধাপের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে এবং দর্শনার্থীদের উক্ত ধাপ গুলি আপনার ব্লগটিকে নেভিগেট বা দেখতে সহায়তা করে।

✪ ব্লগার হিসাবে আপনার প্রায়োজনীয় কিছু দক্ষতা :-

১) স্ব-অনুপ্রেরণা
২) জ্ঞান আহরণের অভ্যাস
৩) ব্লগ বিষয়ক লেখনি শক্তি
৪) লেখনি ধারাবাহিকতা
৫) ধৈর্য
৬) আপনার শ্রোতা মন্ডলী বা আপনার সমাজের চাহিদা বোঝা
৭) সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট চালানোর দক্ষতা।

✪ এইচ.টি.এম.এল.-সি.এস.এস.কোডিং লেখার দক্ষতা :-

কম্পিউটার কোডিংয়ের ভাষা জানাও ব্লগিংয়ের জন্য কিছুটা প্রয়োজনীয় বিষয়। আপনাকে দুর্দান্ত প্রোগ্রামার হতে হবে না, এই সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকাই বাঞ্চনীয়।

✪ ব্লগ লেখার ক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা :-

এই ক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য যে প্রত্যেকটি মানুষ ভিন্ন জাতি, ধর্ম, স্বাদ, রুচিবোধ, চাওয়া পাওয়া ইত্যাদি নিয়ে জন্মগ্রহন করেন এবং এই মানুষরা এই উক্ত গুন অবলম্বনে নিজের জীবন যাপন করে থাকেন । এই মানুষদেরকে আমরা একসাথে সমাজ হিসেবে চিনি।

ব্লগার হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার কোনো এমন বিষয় নিয়ে ব্লগ বানানো বা লেখা উচিত না যাতে কোন ব্যক্তি সমাজ বা কোনো বিশেষ সমাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো বিষয় যেমন জাতি, ধর্ম, স্বাদ, রুচিবোধ, চাওয়া-পাওয়া নিয়ে দুষ্প্রচার বা অরাজকতা তৈরী করে বা সে, তিনি বা তাঁরা কোনো রকম এতে আঘাত পান! তার কারণ প্রত্যেকটি মানুষের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল সমাজকে সুন্দর সুস্থ করে তোলা। সমাজে কোনো রকম অরাজকতা বা দুষ্প্রচার এলে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে সেটা কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত করবে এবং সে, তিনি বা তাঁরাই শুধু নয় সেই আঘাত এর প্রতিফলন সেই ব্লগার অবধিও পৌঁছাতে বাধ্য। একজন ব্লগার তখনি একটি সফল ব্লগার হিসাবে গণ্য হবেন যখন তিনি নিজের ব্লগের সাহায্যে সমাজকে সামুহিক উত্তোলনীকরণ করবেন।

✪ ব্লগ এর সাহায্যে উপার্জন :-

আজকের বিশ্বায়নের সময়ে মানুষ বিভিন্ন প্রকার জীবিকা গ্রহণ করে চলেছে তাঁর মধ্যে ব্লগার হয়েও অনেকে জীবিকা চালাচ্ছেন। এখন কোনো দেশের কোনো বিশেষ উৎপাদিত বস্তু কোনো অন্য দেশের বাজারে বা ওই দেশের বাজারেই প্রচার প্রসার করার জন্য ওই উৎপাদিত বস্তুর কোম্পানিরা ব্লগারদেরকে নিযুক্ত করছেন যারা ওই উৎপাদিত বস্তুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিজের ব্লগে লিখছেন যার জন্য ব্লগাররা ওই কোম্পানির কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা পাচ্ছেন। শুধু এটাই নয় অনেকে বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে কোনো অনলাইন বই রচনা ও বিক্রি করেও উপার্জনের রাস্তা খুঁজেছেন। অনেকে ছবি তুলে ছবি এঁকে, গান গেয়ে, ভিডিও করে অনলাইন বিভিন্ন বিষয়কে কোম্পানিদের হাতে বিক্রি করেও টাকা উপার্জন করেন এবং নিজের কাজ গুলি সর্বসমক্ষে আনার জন্য তাঁরা ব্লগের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

উপরোক্ত কিছু উদাহরণ দেখে বোঝা যায় যে ব্লগার হয়ে টাকা উপার্জন করা সম্ভব এবং এই কাজে কোনো সীমাবদ্ধাতা না থাকায় মানুষ বিভিন্ন প্রকার পথ অধিগ্রহণ করতে পারে।

একটি ব্লগ লেখার উদাহরণ (গান্ধীজি এর জীবন দর্শন)

মহাত্মা গান্ধী শুধু ভারতবর্ষের নয় সমস্ত বিশ্বের এক মহান ব্যক্তিত্বের নাম । বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন যে আগামী প্রজন্ম বোধহয় বিশ্বাস করতেই পারবে না যে হাড় মাংসের এমন একজন কখনো পৃথিবীতে অবতরিত হয়েছিলেন।

যাই হোক আজ মহাত্মার জীবনের একটি ছোট ঘটনা দিয়ে তাঁর সত্যের প্রতি প্রেম এবং চুরির প্রতি ঘৃণা দেখাবার চেষ্টা করছি।

এই ঘটনা এটাও প্রমাণিত করবে যে ভালো এবং উচ্চ গুণটি মানুষের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই দেখা যায় সেটাকে ভবিষ্যতেও দৃঢ় ভাবে টিকিয়ে রাখতে হয়।

গান্ধীজীর জীবনের ছোটবেলার একটি বড় ঘটনা- তখন তিনি স্কুলে পড়তেন। প্রথম বর্ষে একটি পরীক্ষা, সেটিতে একজন ইন্সপেক্টর শিক্ষা বিভাগ থেকে বিদ্যালয়ের

নিরীক্ষণে এসেছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদেরকে একটি শব্দ Kettle লিখতে বলেন। গান্ধীজী সে শব্দটাই ভুল লিখলেন, মাস্টারমশাই এই ভুল দেখে নিজের জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচালেন এবং গান্ধীজিকে পাশের জনের স্লেট এ দেখার ইশারা করেন। কিন্তু গান্ধীজী সেটা করলেন না কারণ তিনি জানতেন যে এটি চুরি এবং তাঁরা দেখছেন । পরে মাস্টারমশাই গান্ধীজিকে ডেকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং নকল করার বুদ্ধি দেন কিন্তু সেটাও তিনি অঙ্গীকার করলেন না।

এই ঘটনাটি বলতে গিয়ে গান্ধীজি লিখেছেন যে

"এটা দেখেও মাস্টারমশায়ের প্রতি আমার বিনয় ভাবনাটি একটুও ক্ষীণ হয়নি, বড়দের দোষ না দেখার গুণ আমার মধ্যে স্বাভাবিক রূপেই ছিল। পরে আমি আমার মাস্টারমশাইদের আরো অনেক দুর্গুণ জানতে পেরেছিলাম তাও ওনাদের প্রতি আমার আদর সম্মান ভাব একই রকম ছিল এবং থাকল। আমি জানতাম বড়দের আজ্ঞা পালন করা আর তাদের কে সম্মান দেওয়া আমার কর্তব্য, তাদের বিচারক হওয়া নয়।"

অনুশীলনী

অ) (১) ব্লগ কাকে বলে ও বিভিন্ন ব্লগ সম্পর্কে যাহা জানো লেখ।

(২) ব্লগ লেখার ইতিহাস সম্পর্কে যাহা জানো লেখ।

(৩) ব্লগ লেখার ক্ষেত্রে যে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার তাহা লেখ।

(৪) ব্লগ লেখার একটি উদাহরণ দাও।

আ) (১) ব্লগের কাঠামো সম্পর্কে যাহা জানো লেখ।

(২) ব্লগের সাহায্যে কিভাবে উপার্জন করা যেতে পারে তাহা লেখ।

১৬. ফিচার লেখন

- শ্রীমতী প্রিয়া রায়

লেখক পরিচিতি

শ্রীমতী প্রিয়া রায় ১৯৭৪ সালে নিউ দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রাথমিক পড়াশুনা এবং শৈশব কেটেছে নিউ দিল্লীতে । তারপর তিনি আগরতলায় চলে আসেন এবং আগরতলার হিন্দু স্কুল থেকে দশম শ্রেনী এবং দ্বাদশ শ্রেনী উত্তীর্ন হন । তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ.পাশ করেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সময়ে তাঁকে ভাষা নিয়ে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ হয় ১৯৯৬ সালে। তিনি ত্রিপুরার ভবনস্ বিদ্যামন্দির স্কুলে হিন্দী শিক্ষিকা হিসাবে ১৯৯৭ থেকে শিক্ষকতার কাজ করে চলেছেন। AGRATALA দূরদর্শন এবং ALL India Radio তে হিন্দী ভাষায় প্রসারক হিসাবে কাজ করছেন। লেখিকার কিছু হিন্দী কবিতা হল 'বিজয়া দশমী', 'অপনা পরায়া', 'বিদায় বেলা', 'স্বচ্ছ ভারত' ইত্যাদি।

পাঠের মূলকথা

আমাদের বিচার বা চিন্তা ভাবনাকে প্রকাশের জন্য আমরা অনেক মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে থাকি। যেমন মোবাইল, ইন্টারনেট, সংবাদপত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি। ফিচার লেখন হল বিভিন্ন ঘটনার বিষয়ে সজীব চিত্র তুলে ধরা। যে কোনো ঘটনার উপর ফিচার লেখন করা যায়। ফিচার লেখনের প্রস্তুতি এমন হওয়া উচিৎ যাতে করে পাঠকেরা একাগ্রমনে, পূর্ণমনোযোগ দিয়ে পড়তে পারে। ফিচার লেখনের ভাষা সহজ সরল ও বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন।

রাহুল : অনেক দিন ধরে তোকে দেখছিনা ! কোথায় থাকিস এখন ?

শ্যাম : মুম্বাইতে আছি ভাই।

রাহুল : কালকে দুপুরে তোদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোকে তো পেলাম না!

শ্যাম : হ্যাঁ। আসলে কালকে আমি বন্ধুবান্ধবদের সাথে বসে একটা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলাম যা আমাদের জীবনে বিভিন্ন ভাবে কাজে আসে।

রাহুল : কি বলছিস...! আচ্ছা বিষয়টা কি একটু খুলে বলবি ?

শ্যাম : সংবাদ লেখনের একটা নতুন কৌশল বা বির্ধিই হল ফিচার লেখন।

রাহুল : বন্ধু ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে বলবি ?

শ্যাম : যখন একটা বিষয়ের বর্ণনা এমন কিছু কৌশলে করা হয় যে পুরো বিষয়টাই যেন চোখের সামনে একটা জীবন্ত ছবির মতো ভেসে উঠে এটাই হল ফিচার লেখন।

রাহুল : আচ্ছা বন্ধু- এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ? এর গুরুত্বই বা কি ? এর উপকারিতা কি কি ? এ বিষয়ে কিছু বল।

শ্যাম : একেবারে ঠিক প্রশ্নই করলি। কিন্তু এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান তো আমারও নেইরে বন্ধু। চল না, আমাদের কাকিমা সীমা দাসগুপ্তা মহাশয়ার কাছে যাই। উনিই আমাদের যথাযথ উওর দিতে পারবেন।

রাহুল : চল্, যাওয়ার পথে অরবিন্দকে ও আমাদের সাথে নিয়ে নিই। আমরা সবাই একসাথে মিলে বুঝব।

শ্যাম : ঠিক। একদম ঠিক বলছিস্।

....

(টিং... টিং... টিং... টিং...)

(দরজা খোলা হল)

শ্যাম : কাকিমা, আসতে পারি?

কাকিমা : আরে তোমরা ! সবাই একসাথে !

বা ! দারুন। আস... আস...।

অরবিন্দ : কাকিমা, আসলে আমরা এসেছি একটা বিষয়ের ব্যাপারে বুঝতে।

কাকিমা : আচ্ছা, আগে তোমরা বস।... এবার বল তোমরা কি বুঝতে ও জানতে চাও?

অরবিন্দ : কাকিমা, আমরা 'ফিচার লেখন'- এই বিষয়টা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে চাই - এর বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, উপকারীতা, লেখন কৌশল ইত্যাদি।

কাকিমা : বেশ, দারুণ প্রশ্ন করলে। এখন তোমরা সবাই মন দিয়ে শোন।

'ফিচার লেখন কাকে বলে?' - এটা প্রথমে ভালোভাবে বুঝে নাও। ফিচার লেখন হল- আমদের বিচার বা চিন্তা- ভাবনা প্রকাশের একটা মাধ্যম।

আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনাকে প্রকাশ করার জন্য যে মাধ্যমের সাহায্য নিই সেগুলি হল- মোবাইল, ইন্টারনেট, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, গল্প, কবিতা ইত্যাদি। পত্র-পত্রিকায় যেমন বিজ্ঞান-মনোরঞ্জন-সিনেমা-খেলাধুলা-রাজনীতি এবং অন্যান্য সব কিছুর খবর থাকে। এই সব দৈনন্দিন জীবনের সব কিছুকে নিয়ে এক-একটা ফিচার তৈরী করার একটা অন্যরকম গুরুত্ব বা তাৎপর্য আছে। খবর যেখানে আমাদের লোকজনের ও ঘটনার বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য জানান দেয়, সেখানে 'ফিচার লেখন', তথ্য জানানোর পাশাপশি - রোচকতথ্য প্রদান ও মনোরঞ্জন ও প্রদান করে থাকে।

ফিচার লেখন হল ঘটনার একটা সজীব চিত্র তুলে ধরা।

অরবিন্দ : কাকিমা, ফিচার লেখনে পাঠকদের কি লাভ হয় ?

কাকিমা : ফিচার লেখনের মাধ্যমে পাঠকেরা একাগ্রমনে, পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তথ্যকে ভালোভাবে জানতে এবং বুঝতে পারে।

রাহুল : খবর এবং ফিচারের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় ?

কাকিমা : সংবাদ লেখন বা খবরে শুধু ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়।

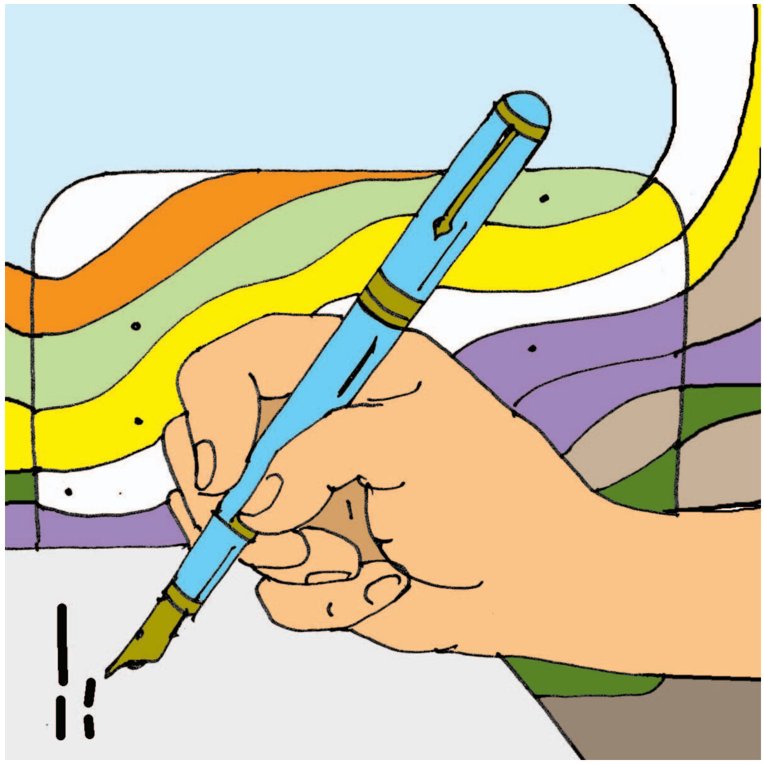

আর ফিচার লেখন এই ধরণের কোন নিয়ম প্রয়োজ্য নয়। ফিচার লেখনের মাধ্যমে ঘটনাকে বা বিষয়কে পাঠক বা দর্শকের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরা হয়। সংঘটিত কোন ঘটনার উপরই যে শুধু ফিচার লেখা যায় - তা কিন্তু নয়- এমন কোন ঘটনা যা এখনো হয়নি- তার উপরও ফিচার লেখা যায়- বা তৈরী করা যায়। তোমরা চাইলে তাজমহলের উপর ফিচার লিখতে পার বা নোটবন্ধির উপর ফিচার লিখতে পার, এমন উদাহরণ দেওয়া যায়।

রাহুল : কাকিমা, ফিচার কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর লেখা যায়?

কাকিমা : খুব ভালো প্রশ্ন করলে রাহুল। শোন-ফিচার জীবনশৈলী, ব্যক্তিগত, যাত্রা প্রভৃতি বিষয়ের উপর লেখা হয়ে থাকে।

শ্যাম : ফিচার লেখনের কি কি নিয়ম রয়েছে?

কাকিমা : ফিচার লেখন অনেকটা কাহিনী বা উপন্যাস লেখার মতোই হয়ে থাকে । এতে সূচনা, মূলবিষয় বস্তু (মধ্যভাগ), চরম সমাপ্তি বা উপসংহারের সাথে ভাষার কৌশল প্রয়োগ হয়ে থাকে ।

১) **সূচনা :-** ফিচার লেখনের শুরু বা সূচনা কোন ঘটনা বা যাত্রার উপর হয়ে থাকে।

২) **মূল বিষয়বস্তু :-** (মধ্যভাগ) এই অংশে ঘটনার প্রাথমিক তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এবং এখান থেকেই পাঠক ঘটনার প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে এবং চরম পরিণতি কি হবে তা জানার জন্য পড়তেই থাকবে।

৩) **সমাপ্তি উপসংহার :-** এইটা হল ফিচারের সেই অংশ যেখানে লেখক কিছু প্রশ্ন করেন এবং নিজের মতামত বা বিচারকে তুলে ধরেন এবং লেখার ইতি টানেন।

* **ভাষার কৌশল :-** ফিচারের ভাষা সহজ-সরল বোধগম্য এবং আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন যাতে পাঠকের মনোযোগকে আকর্ষণ করা যায়।

রাহুল : কাকিমা, আমরা কি কেবলমাত্র সংবাদপত্র ফিচার লেখার মাধ্যমেই রোজগারের একটা উপায় তৈরী করতে পারব ? নাকি অন্য আরও জায়গা আছে যেখানে ফিচার লেখার মাধ্যমে রোজগারের ব্যবস্থা করা যাবে ?

কাকিমা : আছে বৈকি। অবশ্যই আছে। আজকে ছাত্র-ছাত্রী ও যুব সম্প্রদায় ভালো লেখার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে। আজকের এই ইন্টারনেটের যুগে ফিচার লেখার ব্যপ্তিটা আরও প্রশস্ত ও সহজ এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ফিচারের প্রকাশিত প্রত্যেকটা তথ্য সত্য এবং নিরপেক্ষ হওয়া।

ফিচার তৈরী করে, ফিচার লেখক হয়ে যে কেউ ভালো রোজগার করতে পারে। বর্তমানে অনেক মঞ্চ রয়েছে যেখানে ভালো ফিচার লিখে অনেক টাকা পয়সা রোজগার করা যায়। অনেক সংবাদ-পত্র আছে যারা ভালো ফিচার লেখকদের তাদের লেখনির জন্য মোটা অঙ্ক দিতে ও প্রস্তুত । শুধু তাই নয়- লেখক নিজে blog খুলে ওখানে প্রতিনিয়ত ফিচার খুলেও ভালো অঙ্কের টাকা রোজগার করতে পারেন।

আর এসব কিছুর জন্য যা খুব অত্যাবশ্যকীয় তা হল ভালো অভ্যাস বা চর্চার মধ্যে দিয়ে ভালো ফিচার লেখার কৌশল শেখা।

সবশেষে এটাই তোমাদের বলব যে- ফিচার লেখনের মূল উদ্দেশ্য হল পাঠককে শুদ্ধ ও মনোরঞ্জনদায়ক লেখা প্রদান করা যা পাঠকের রুচি ও আগ্রহকে অনেক অনেক বাড়িয়ে দেবে। পাঠকের জিজ্ঞাসাকে শান্ত করার ক্ষমতাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবে। এছাড়া ভালো ফিচার লেখনের দক্ষতা অর্জন রোজগারের সুযোগ বাড়িয়ে বেরোজগারী বা বেকারত্বকে দূর করতে সহায়ক হবে।

অনুশীলনী

অ) (১) ফিচার লেখন পাঠ্যে রাহুল এবং শ্যামের মধ্যে যে কথোপকথন রয়েছে তাহা লেখ।
(২) ফিচার লেখনের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, উপকারিতা এবং লেখন কৌশল সম্পর্কে যাহা জানো লেখ।
(৩) ফিচার লেখনের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আলোচনা করো।
(৪) ফিচার লেখনের মাধ্যমে কিভাবে রোজগারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তাহা লেখ।

আ) (১) ফিচার লেখন সম্পর্কে তুমি যাহা জানো লেখ।
(২) খবর এবং ফিচারের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা লেখ।
(৩) ফিচার লেখনের মূল উদ্দেশ্য কি ?

১৭. ভাব সম্প্রসারণ - বাংলা ভাষা শিক্ষার একটি প্রসঙ্গ

- শ্রী নীতীশ বিশ্বাস

লেখক পরিচিতি

প্রাক্তন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। লেখক ও ভাষা গবেষক। সাহিত্যিক সোমেন চন্দ, অদ্বৈত মল্লবর্মন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতরত্ন ড: বি.আর. আম্বেদকরের জীবনীকার। ভারতের বাঙালি উদ্বাস্তু, দলিত সাহিত্য ও বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞ। বিশিষ্ট সমাজ সেবী। সম্পাদক, ঐকতান গবেষণা পত্র।

ভাব সম্প্রসারণের অর্থ :-

কোন সংহত বিষয়কে তার নিহিত ভাবগত ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতিগত অর্থকে ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করাকে ভাব - সম্প্রসারণ বলা হয়। এর পেছনে থাকে জীবন-মন্থন জাত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা।

এখানে আলোচিত বিষয় বিভাগ :-

১) ভাব- সম্প্রসারণের বিস্তার ১) ভাব সম্প্রসারণের পরিভাষা সংজ্ঞা। ভাব সম্প্রসারণের আবশ্যকতা। ৪) ভাবসম্প্রসারণের মাহাত্ম্য। ৫) ভাব সম্প্রসারণের দুটি দৃষ্টান্ত। ৬) উপসংহার।

গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা :-

সেদিন বাংলা ক্লাশে ছাত্র- ছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে তর্ক চলছিল।

মনীষ বলছিল,---‘‘ভাব সম্প্রসারণ মানে হল, ভাব কত রকম ভাবে বাড়ানো যায়।’’ কণিকা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, - ‘‘তুই কিচ্ছু জানিস না। ভাব সম্প্রসারণ মানে হল, একটা কথায় কত রকমের ভাব মনে আসে।’’ আরো কেউ কেউ কিছু কথা বলছিল, শোনা যাছিল না। সমীর সবাইকে থামালো কারণ সে তো ক্লাসের মনিটর, তাকে ক্লাসের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হয়।

সে বলল, ‘চলো স্যারের কাছে যাই।’

সমীরই আগে ছুটে গেল টিচারর্স রুমে। অসীম স্যারকে বিষয়টি বলতেই, তিনি বললেন, --- ’’ তোমরা ক্লাসে যাও, আমি আসছি।’’ অসীমবাবু হেড স্যারকে বলেই, ছাত্রদের প্রায় পেছনে পেছনে তাদের ক্লাসে ঢুকলেন।

বললেন, -- ‘তোমাদের কথা তো শুনলাম। সত্যিই ভাব সম্প্রসারণ করা আমাদের জীবনে অনেক সময়েই প্রয়োজন হয়।’

ছাত্ররা একত্রে বলে উঠল, --- ‘কি ভাবে স্যার ?’

‘‘---বোস, বোস, আমি একটা দুটো উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। তার আগে একটা গল্প বলি, শোনো। - তোমরা অনেকেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নাম শুনেছ।’’

কেশব বলে উঠলো, ‘‘না স্যার শুনিনি।’’

---শুনবে কোথা থেকে, তোমাদের জন্ম তো এই রাজ্যে, মহারাষ্ট্রে। চিত্তরঞ্জন ছিলেন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক মহান পুরুষ । দেশপ্রেমিক আইনজীবী। তিনি ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ভুবনমোহন দাস আর ঠাকুরদার নাম ছিল কাশীশ্বর দাস। তার পূর্বপুরুষ অবশ্য পূর্ব বাংলার ঢাকার বিক্রমপুরের বাসিন্দা ছিলেন। ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অনুগামী। - সে যাই হোক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বিদেশে থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করে এসে আইন ব্যাবসা শুরু করেন। তিনি বিখ্যাত হন ঋষি অরবিন্দের বিরুদ্ধে আলিপুর বোম কেসে আইনী যুদ্ধে অসামান্য সাফল্যের মধ্যে। এ ছাড়া তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে নানা ভাবে যোগ দেন। এই উদার হৃদয় স্বাধীনতা সংগ্রামী সি আর দাসের মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধীর করা ঐতিহাসিক মন্তব্য থেকে নজরুল ইসলামের কবিতা ছাড়াও অনেকেই তার মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করে অনেক কথা বলেন । কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন মাত্র দুটি ছত্র, যেখানে তিনি বলেন:

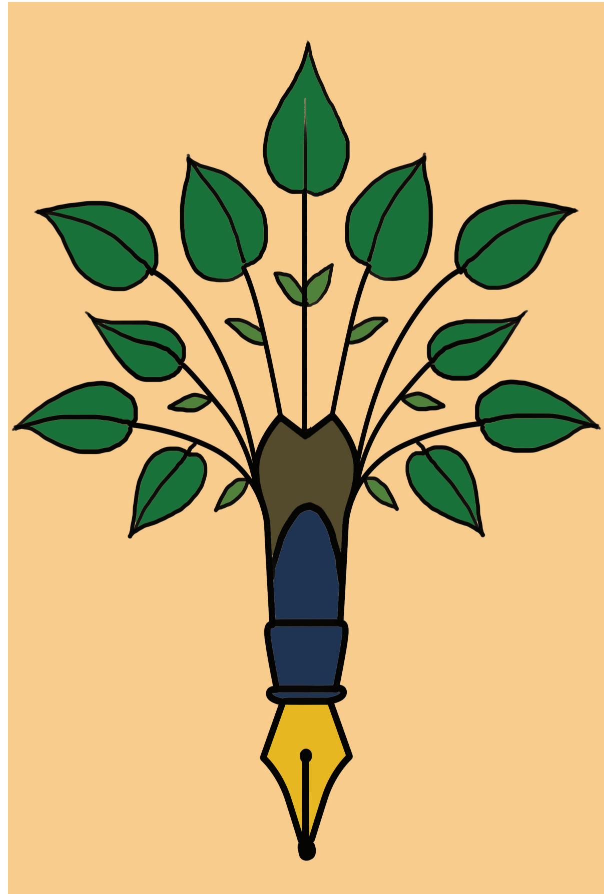

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

এসো আমরা এই দুটি অমর পংক্তির ভিতরে নিহিত ভাবের ব্যাখ্যা করি। যে ব্যাখ্যার মধ্যেই আমরা পাব আমাদের আলোচ্য ভাব সম্প্রসারণ।

--স্যার মৃত্যুহীন প্রাণ মানে কি ?

--- যে মানুষের বিশাল হৃদয় সর্বদা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান এবং দেশপ্রেমে তার সমগ্র স্বার্থ-চিন্তা আর বিপদের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যান। তিনিই তো "জীবন- মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" করে নেন। তার প্রাণ কী অমর বা মৃত্যুহীন নয় ?

--- হ্যাঁ স্যার।

--তাহলে তো বুঝলে এই কবিতার এক একটি শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কত ইতিহাস আর চিত্তরঞ্জন দাসের মতো অমর প্রাণের কত ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয়। এ ভাবেই আমরা দর্শনের বা সাহিত্যের কোন হীরক খণ্ড থেকে খুঁজে নিতে পারি জীবনের সমাজের অমূল্য শিক্ষা। এই যে ব্যাখ্যা আর পরিচয় তুলে ধরছি তার মধ্যেই আমরা খুঁজে পাবো কোন ভাবের সম্প্রসারণের কথা। আর

একটি কথা বলি, --- এটাও ইতিহাস থেকে, সে হল, এই কবিতা খণ্ড সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হবার পর সারা বাংলার মানুষ যেন পাগলের মতো তা মুখে মুখে আবৃত্তি করতে লাগলেন। আসলে তার মধ্যে তারা পেলেন তাদের অন্তরের হৃদয়ের সুর মূর্ছণা। বেদনার অশ্রু-সজল অভিব্যক্তি।

---কেনো স্যার। প্রশ্ন টা করতে করতে শ্যামলীর কণ্ঠ যেন ধরে আসছে।

---শোন শ্যামলী, তোমরা সকলেই দেখো, আমি কবিতাটি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি, তোমরা সকলে এটা পড়।

এ কথা বলে অসীম বাবু তার সুন্দর হাতের লেখায় বোর্ডে লিখলেন :

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

তার পর ক্লাসে সবচেয়ে ভালো কণ্ঠের অধিকারী রমাকে বোর্ডের কাছে ডেকে নিলেন এবং বললেন ---, জোরে জোরে পড়।

সবাইকে বললেন।

১) - খাতায় লাইন দুটি লিখে নাও। লেখা শেষ হলে বললেন

২) - এবার রমা আবার পড়বে, তোমরা অনুচ্চস্বরে সেটা তার সঙ্গে পড়।

পড়া শেষে অসীমবাবু বললেন,

--দেখো এই দুটি লাইনের মধ্যে যেন ধরা পড়েছে চিত্তরঞ্জনের সমগ্র জীবনমন্থন জাত অমৃত। এ যেন একটি বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। এই যে আলোচনার, ব্যাখ্যা করার চেষ্টা এখানেই এসে দেখা দেয় কোনো বিষয়ের ভাব সম্প্রসারণের উপযোগিতা। অসীম বাবু এবার ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন,

--তোমরা তাহলে বুঝলে ভাব সম্প্রসারণের অর্থ হল:, সংক্ষেপে ব্যক্ত কোন ভাবকে আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা, ইতিহাস ও জীবনাভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করতে পারলে তা-ই হল ভাব সম্প্রসারণ।

-- এবার তোমাদের পালা।

- ছাত্ররা বললে --- কি করতে হবে স্যার।

অসীম বাবু বললেন -- আমি কয়েকটি কবিতার বিশেষ অংশ বোর্ডে লিখে দিচ্ছি, যার সম্প্রসারণ তোমরা বাড়িতে বসে নিজের মতো করে আনবে। যারা যা ভাবছ লিখবে আমি অবশ্য পরের কোন ক্লাসে এ বিষয়ে আবার আলোচনা করব। খাতায় লিখে নাও

১) **কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,**
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।।

- কৃষ্ণ চন্দ্র

২) **জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি,**
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত একই রবি শশী মোদের সাথি।

জাতির পাতি - সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৩) **ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়**
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

হে মহা জীবন-সুকান্ত ভট্টাচার্য

৪) **যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,**
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

প্রশ্ন (পরিশেষ) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫) **যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,**
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে ।

দুর্ভাগা দেশ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---সবগুলো করতে হবে স্যার ?

---না, যেকোন দুটো করে ভাব সম্প্রসারণ করে আনবে। তবে নীচের পয়েন্ট গুলি মনে রাখবে:

১) ভাব সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার মতো করে কবি বলেছেন, বা লেখক বলেছেন, এই জাতীয় কোন উক্তির বা মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

২) মূলভাবটির সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন বিষয় বা ভাবনাকে আনা উচিত হবে না।

৩) সাধারণ ভাবে ১৫০-১৬০ শব্দের মধ্যে লেখাটি রাখতে চেষ্টা করবে ।

৪) যখন প্রশ্ন পত্রে সম্প্রসারণের বিষয়টি দেওয়া হবে, তা মনোযোগ সহকারে পড়ে নেবে।

৫) প্রদত্ত অংশে রূপক বা সাংকেতিক অর্থ ব্যবহৃত হলে, তা দিয়ে লেখক কি বুঝিয়েছেন তা অনুধাবনের চেষ্টা করবে।

৬) সহজ ভাষায় অর্থাৎ নিজের ভাষায় এবং সংক্ষেপে ভাবসত্যটি উপস্থাপন করতে হবে।

৭) প্রয়োজনে দৃষ্টান্ত, প্রাসঙ্গিক (ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক) তথ্য, উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যাবে।

৮) একই বক্তব্যের বার বার ব্যবহার যেন না হয়।

৯) সাধারণ ভাবে গোটা লেখাটিকে মনে মনে তিন ভাগে লিখতে চেষ্টা করবে যথা: (ক) মূলভাব (খ) তার সম্প্রসারিত ভাব (গ) মন্তব্য।

১০) বাংলায় সাধু ও চলিত রীতি আছে । চেষ্টা করবে তার ব্যবহার যেন মিশে না যায়।

তোমরা আমার সঙ্গে এতক্ষণ যে আলাপ আলোচনা করলে তার থেকে এসো আমি তোমাদের জন্য দুটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আজকের আমাদের ক্লাশটা শেষ করি।

এক নং ।।

যুগের ধর্ম এই
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া
দেবে তোমাকেই ।

ভাব সম্প্রসারণ :

এই জগতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হল মানুষ । এই মানুষই একে অন্যের উপর পীড়ন করে, করে নানা রকম অত্যাচার। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম হল, যে পীড়ন করে কোন না কোন ভাবে তাকেও পীড়নের শিকার হতে হয় । আমরা ধুলোকে যদি পদাঘাত করি তা হলে ঐ ক্ষুদ্রতম ধুলো আমাদের মাথায় উঠে পড়ে । যুব বয়সে অনেকে গায়ের জোরে অনেক অন্যায় অত্যাচার করে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে অথবা পরিস্থিতির পরিবর্তনে তাদের অনেকেই আমরা দেখি নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। রাজনৈতিক উত্থান পতনে হামেশাই আজও আমরা এই সব চিত্র দেখতে পাই।

আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞজনের শিক্ষা হল এই পৃথিবীতে কোন মানুষকেই অবহেলা করা উচিত নয় । আজ যদি আমি কাউকে অবহেলা করি তাহলে আগামী দিনে আমাকেও হয়তো অন্যের দ্বারা এমনি অবজ্ঞা ও নির্যাতনের পাত্র হতে হবে । এটাই যুগের শিক্ষা, তা যেন আমরা গ্রহণ করি ।

দুই নং ।। গদ্য দৃষ্টান্ত ।।

"এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে ।"

ভাব সম্প্রসারণ :

জন্ম বা মৃত্যুর উপর আমাদের কোন হাত নেই। আমরা কোন ভাবেই আমাদের পিতা মাতাকে বা আমার জন্ম হয় যে পরিবারে তা পরিবর্তন করতে পারি না । তাই কেউ ধনী ঘরে কেউ বা দরিদ্র ঘরে জন্মাই । এটা দৈব নির্ভর। কিন্তু মানুষের নিজের পৌরুষ বা মানবিক ক্ষমতা তৈরি হয় অনেকটাই তার নিজের সাধনা ও সংগ্রামের ফলে । তাই আমরা দেখি অনেক গরিব ও নি:স্ব পরিবারে জন্মেও অনেকে তার স্বীয় সাধনায় অপ্রানান্ত প্রয়াসে কেউ বিরাট ধনী, জ্ঞানী, বিদ্বান, ক্ষমতাবান হয়ে থাকেন । যেমন মহাবীর কর্ণ রাজ পুত্র ছিলেন না । ছিলেন সুত পুত্র । তা সত্ত্বেও তিনি তার বুদ্ধি ও পারদর্শিতায় আর হৃদয়ের মহত্ত্বে একদিকে হয়েছিলেন রাজা অন্য দিকে তিনি ছিলেন দাতা কর্ণ ।

অন্য দিকে রাজপুত্র হয়ে জন্মালেও তিনি কিন্তু ভিখারি হয়ে যেতে পারেন, যদি না তিনি তা রক্ষার জন্য দক্ষতা ও বুদ্ধির অধিকারী হন । আমরা দেখেছি পিতার অঢেল ঐশ্বর্য থাকলেও অমিতচারিতা ও চরিত্রের স্খলন পতনের জন্য সে পথ কুক্কুরের মতো হয়ে যেতে পারেন । অন্য দিকে আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা হল সমস্ত সফল মানুষকে নিরলস ভাবে নিজের ভাগ্য যারা গড়তে সতত সচেষ্ট থাকেন তাদের সাফল্য একদিন না একদিন আসেই । এ কথা তাই বলা যেতে পারে নিজের ভাগ্য মুখ্যত নিজের হাতে ।

উপসংহার :

আমাদের জীবনে নানা শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। তার কোথাও আমরা পাই অনেক বিস্তার। তাকে গ্রহণ করতে হয় আর সংক্ষেপ করে আবার অনেক বার্তা জীবনে আসে রূপক, সংকেত আর নানা ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তিতে। তাকে তখন নিজে বুঝতে অপরকে বোঝাতে হয় সম্প্রসারিত করে। আমাদের ভাষা শিক্ষার পূর্ণতার জন্য এই ভাব সম্প্রসারণ তাই খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত।

নিতিশ বিশ্বাস - লেখক-সংশোধক
কলকাতা বিদ্যাপীঠ, রেজিস্টার

অনুশীলনী

(১) ভাবসম্প্রসারণ বলতে কি বোঝায় ?

(২) ভাবসম্প্রসারণ করা আমাদের জীবনে প্রয়োজন কেন ?

(৩) ভাবসম্প্রসারণ করার সময় কোন কোন বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার ?

(৪) ভাবসম্প্রসারণের মাহাত্ম্য স্পষ্ট করো।

(৫) ভাবসম্প্রসারণের ভাষা কেমন হওয়া উচিৎ ?

(৬) নিম্ন পঙক্তিগুলির ভাবসম্প্রসারণ করো :

অ) "অহংকারই পতনের মূল।"

আ) "অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

ই) "কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক ? কে বলে তা বহুদূর ?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ, নরক, মানুষেতে সুরাসুর।"

ঈ) "শুনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
স্রষ্টা আছে বা নাই।"

পরিশিষ্ঠ

সমাস

সংক্ষেপে সুন্দর করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যে পরস্পর অর্থ সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তাহার বেশী পদকে এক পদে পরিণত করার নাম সমাস।

সমস্তপদ : সমাসে একাধিক পদ মিলিত হইয়া যে একটি পদ গঠন করে, তাহাকে সমস্তপদ বা সমাস-বদ্ধ পদ বলে।

সমস্যপদ : যে সমস্ত পদের সমন্বয়ে সমস্ত-পদের সৃষ্টি, তাহাদের প্রত্যেকটিকে সমস্যমান পদ বলে।

আমরা বাংলা সমাসকে মোটামুটি ছয় প্রকার ধরিয়া লইয়াছি- দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব।

নীচে ব্যাসবাক্য সহ সমাসের উদাহরণ দেওয়া হল।

অ. ক্রং	সমস্তপদ	ব্যাস বাক্য	সমাসের নাম
১	ভীমার্জুন	ভীমওঅর্জুন	দ্বন্দ্ব সমাস
২	ধর্মকর্ম	ধর্ম ও কর্ম	দ্বন্দ্ব সমাস
৩	শীতোষ্ণ	শীত ও উষ্ণ	দ্বন্দ্ব সমাস
৪	সীতারাম	সীতা আর রাম	দ্বন্দ্ব সমাস
৫	রথ দেখা	রথকে দেখা	তৎপুরুষ সমাস
৬	বেতাল	তাল নয়	তৎপুরুষ সমাস
৭	মুখস্থ	মুখে থাকে যাহা	তৎপুরুষ সমাস
৮	পিতৃতুল্য	পিতার তুল্য	তৎপুরুষ সমাস
৯	পীতাম্বর	পীত যে অম্বর	কর্মধারয় সমাস
১০	রক্তচন্দন	রক্ত (লাল) যে চন্দন	কর্মধারয় সমাস
১১	ঘনশ্যাম	ঘনের (মেঘের) ন্যায় শ্যাম	কর্মধারয় সমাস
১২	দর্শন শাস্ত্র	দর্শন বিষয়ক শাস্ত্র	কর্মধারয় সমাস
১৩	পঞ্চবটি	পঞ্চ বটের সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৪	নবরাত্র	নব রাত্রির সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৫	সপ্তাহ	সপ্ত অহ(দিন) এর সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৬	তেমোহনা	তিন মোহনার সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৭	আশীবিষ	আশীতে (দাঁতে) বিষ যার	বহুব্রীহি সমাস
১৮	মধ্যবিত্ত	মধ্যবিত্ত যার	বহুব্রীহি সমাস
১৯	দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি সমাস
২০	নিরন্ন	নাই অন্ন যার	বহুব্রীহি সমাস
২১	উপকূল	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব সমাস
২২	দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস
২৩	অনুগুন	গুনের যোগ্য	অব্যয়ীভাব সমাস
২৪	গরমিল	মিলের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস

সন্ধি বিচ্ছেদ

অ. ক্রং	শব্দ		সন্ধি বিচ্ছেদ
১	যথেচ্ছা	-	যথা + ইচ্ছা
২	সপ্তর্ষি	-	সপ্ত + ঋষি
৩	আদ্যন্ত	-	আদি + অন্ত
৪	বারেক	-	বার + এক
৫	শতেক	-	শত + এক
৬	দৈব	-	দা + এব
৭	বনোৎসব	-	বন + উৎসব
৮	ভাবুক	-	ভৌ + উক
৯	পর্যন্ত	-	পরি + অন্ত
১০	বৃহস্পতি	-	বৃহত + পতি
১১	স্বায়ত্ব	-	স্ব + আয়ত্ব
১২	নিস্তেজ	-	নি: + তেজ
১৩	স্বল্প	-	সু + অল্প

অ. ক্রং	শব্দ		সন্ধি বিচ্ছেদ
১৪	মনস্তাপ	-	মন: + তাপ
১৫	পরস্পর	-	পর + পর
১৬	নিশ্চিহ্ন	-	নি: + চিহ্ন
১৭	নবান্ন	-	নব + অন্ন
১৮	পার্বন	-	পৌ + অন
১৯	মহোৎসব	-	মহা + উৎসব
২০	নয়ন	-	নে + অন
২১	রবীন্দ্র	-	রবি + ইন্দ্র
২২	অন্বেষন	-	অনু + এষন
২৩	প্রত্যহ	-	প্রতি + অহ
২৪	মতৈক্য	-	মত + ঐক্য
২৫	পরমানন্দ	-	পরম + আনন্দ
২৬	গিরীশ	-	গিরি + ঈশ

বাগধারা

অ. ক্রং	শব্দ		অর্থ
১	পাকা ধানে মই	-	ক্ষতি করা
২	লঙ্কাকান্ড	-	তুমুল ঝগড়া
৩	কথা দেওয়া	-	প্রতিশ্রুতি দেওয়া
৪	আকাশে তোলা	-	অত্যধিক প্রশংসা করা
৫	অরন্যে রোদন	-	নিস্ফল অনুনয়
৬	একচোখা	-	পক্ষপাতদুষ্ট
৭	বুকের পাটা	-	খুব সাহসী
৮	গাছপাথর	-	হিসাব
৯	আকাশ থেকে পড়া	-	অত্যধিক বিস্মিত হওয়া
১০	গুড়ে বালি	-	নিস্ফল আশা

অ. ক্রং	শব্দ		অর্থ
১১	কড়ায় গন্ডায়	-	পুরোপুরি
১২	তাসের ঘর	-	ক্ষণ ভঙ্গুর
১৩	কলুর বলদ	-	পরাধীন / অপদার্থ
১৪	নখদর্পণে	-	কন্ঠস্থ
১৫	কলের পুতুল	-	ব্যক্তিত্বহীন
১৬	ফাঁকা আওয়াজ	-	বৃথা আস্ফালন
১৭	গোবর গণেশ	-	নির্বোধ
১৮	ভস্মে ঘি ঢালা	-	অপব্যয় করা
১৯	চক্ষুশূল	-	অপ্রিয় ব্যক্তি
২০	ভরাডুবি	-	মহাসর্বনাশ
২১	টনক নড়া	-	চৈতন্য হওয়া

অ. ক্রং	শব্দ		অর্থ
২৩	মগের মুলুক	-	অরাজক
২৪	টাকার কুমির	-	বিপুল সম্পত্তির মালিক
২৫	হাড় জুড়ানো	-	স্বস্তিলাভ
২৬	পথে বসানো	-	দারুণ বিপদে ফেলা

অ. ক্রং	শব্দ		অর্থ
২৭	হাত করা	-	বশে আনা
২৮	ননীর পুতুল	-	শ্রমবিমুখ
২৯	কাঁচা পয়সা	-	নগদ অর্থ
৩০	কপাল ভাঙ্গা	-	ভাগ্য মন্দ

বাক্য সংকোচন

অ. ক্রং	বাক্য		বাক্য সংকোচন
১	ননদের স্বামী	-	নন্দাই
২	বাঁচতে ইচ্ছুক	-	জিজীবিষু
৩	স্বর্গের গঙ্গা	-	মন্দাকিনী
৪	হাস্যরসাত্মক নাটক	-	প্রহসন
৫	পঙ্কের জাত	-	পঙ্কজ
৬	রসবোধ আছে যার	-	রসিক
৭	মনুর পুত্র	-	মানব
৮	নিজের প্রয়োজন	-	স্বার্থ
৯	বড়োর ভাব	-	বড়াই
১০	সংযত ব্যবহার	-	মিতাচার
১১	ধনীর বাসগৃহ	-	হর্ম্য
১২	ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল যে	-	বাউল
১৩	হাতে হাতে যুদ্ধ	-	হাতাহাতি
১৪	যার মৃত্যু আসন্ন	-	মুমূর্ষু
১৫	সাঁঝের ধোঁয়া	-	সাঁজাল
১৬	শব্দ শুনে লক্ষ্য ভেদ	-	শব্দভেদী
১৭	ইটের গুঁড়া	-	সুরকি
১৮	যার ভাতের অভাব	-	হাভাতে
১৯	সতের ভাব	-	সত্তা / সততা
২০	নিজের ইচ্ছা	-	স্বেচ্ছা
২১	একমায়ের পেটের জাত	-	সোদর
২২	রাধার পুত্র	-	রাধেয়
২৩	যার হস্তাক্ষর সুন্দর	-	খোশনবিস
২৪	চোখে দেখা যায়	-	চাক্ষুষ

অলঙ্কার

অর্থালঙ্কার : শব্দের অর্থরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি তাহাদের অর্থালঙ্কার বলে।

১) উৎপ্রেক্ষা : নিকট-সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলিয়া প্রবল সংশয় হইলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ: অ) পড়ুক দুফোঁটা অশ্রু জগতের পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক। - রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : এখানে উপমেয় - দুফোঁটা অশ্রু।

উপমান : দুটি বাল্মীকির শ্লোক। উপমেয় দুফোঁটা অশ্রুকে উপমান 'দুটি বাল্মীকির শ্লোক' বলিয়া কবির যে প্রবল সংশয় হইয়াছে, তাহা যেন শব্দের প্রয়োগেই বোঝা যাইতেছে। সুতরাং ইহা উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের উদাহরণ।

আ) বসিলা যুবতী :
পদতলে, আহামরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল। - মধুসূদন

২) সন্দেহ : যেখানে উপমেয় ও উপমান উভয় পক্ষে সমান সংশয় থাকে, সেখানে সন্দেহ অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ: অ) সোনার হাতে সোনার চুড়ী,
কে কার অলঙ্কার ? - মোহিতলাল

ব্যাখ্যা : উপমেয় - সোনার হাত। উপমান- সোনার চুড়ী। সোনার হাতে সোনার চুড়ী অলঙ্কার হইতে পারে, আবার সোনার চুড়ীর পক্ষে সোনার হাত অলঙ্কার হইতে পারে। সংশয় উপমেয় ও উপমান উভয় পক্ষেই সমান সংশয় রহিয়াছে ইহা সন্দেহ অলঙ্কারের উদাহরণ।

আ) কে তুমি হেথা বিজনে বসি -
নর, কি ঋষি, দেবতা ?
অঙ্গ ছাপি পুনপ্রভা চমকে। - বিজয়চন্দ্র মজুমদার

৩) অপহ্নুতি : যদি উপমেয়কে অস্বীকার বা নিষিদ্ধ করিয়া উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ: ১) চোখে চোখে কথা নয়গো, বন্ধু,
আগুনে আগুনে কথা।

ব্যাখ্যা : এখানে উপমেয় 'চোখকে' অস্বীকার করিয়া ('নয়গো' কথাটি লক্ষনীয়) উপমান 'আগুনকে' প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা অপহ্নুতি অলঙ্কারের উদাহরণ।

উদাহরণ : ২) আমি তৃষিতের প্রাণের নিশীথে বাসনা
বাসন্তিকা, ধুমনয় সে যে অলি - লাঞ্ছন কাঞ্চন- মল্লিকা। - মোহিতলাল

সঙ্কেত : উপমেয় : (দীপশিখার উপর) 'ধুম'

উপমান - (কাঞ্চন মল্লিকার উপর) 'অলি', 'নয়' শব্দের দ্বারা উপমেয় নিষিদ্ধ।

উদাহরণ : ৩) কপালে সিন্দুরবিন্দু নব অরবিন্দ বন্ধু
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির মেলা, ধরিয়া কুন্তলছলা
বন্দী সে করিলা রবি-ইন্দু।

ব্যাখ্যা : এখানে উপমেয় - কুন্তল, উপমান-তিমির।
'ছলা' শব্দ ব্যবহার করিয়া উপমেয়টিকে অস্বীকার ও উপমানটিকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা অপহ্নুতি অলঙ্কারের উদাহরণ।

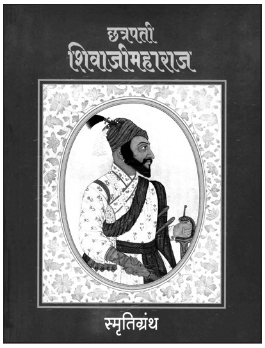

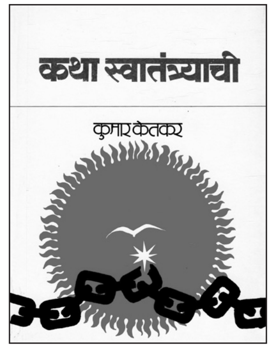

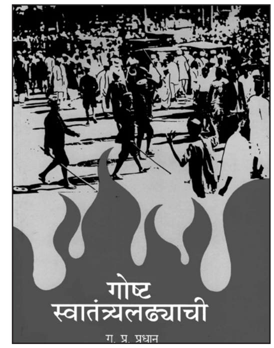

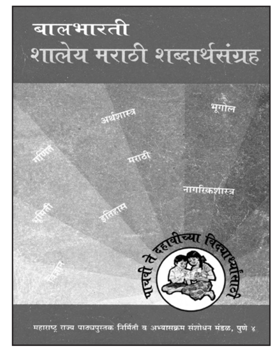

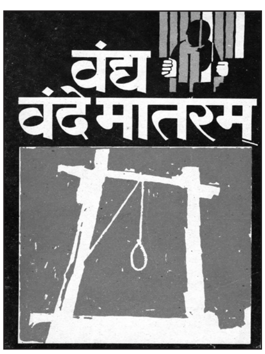

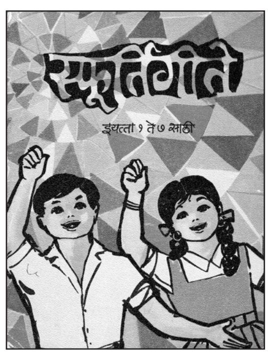

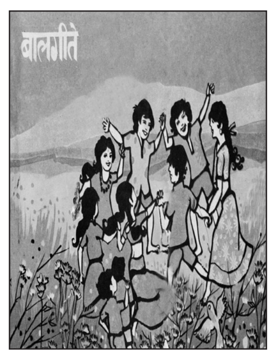

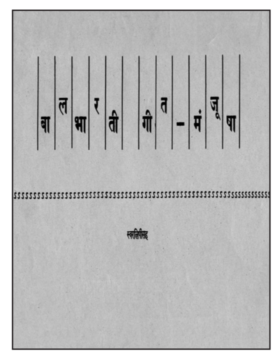

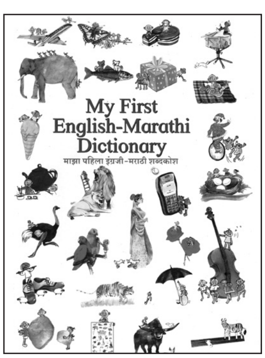

- पाठ्यपुस्तक मंडळाची वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ्येत्तर प्रकाशने.
- नामवंत लेखक, कवी, विचारवंत यांच्या साहित्याचा समावेश.
- शालेय स्तरावर पूरक वाचनासाठी उपयुक्त.

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेत स्थळावर भेट द्या.

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२१७१, नागपूर - ☎ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে

युवकभारती इयत्ता बारावी (बंगाली भाषा)

₹ 104.00